2002

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৪ বর্ষ ◆ ২৩তম সংখ্যা

১৫ জুন, ২০০২ ঈসাব্দ

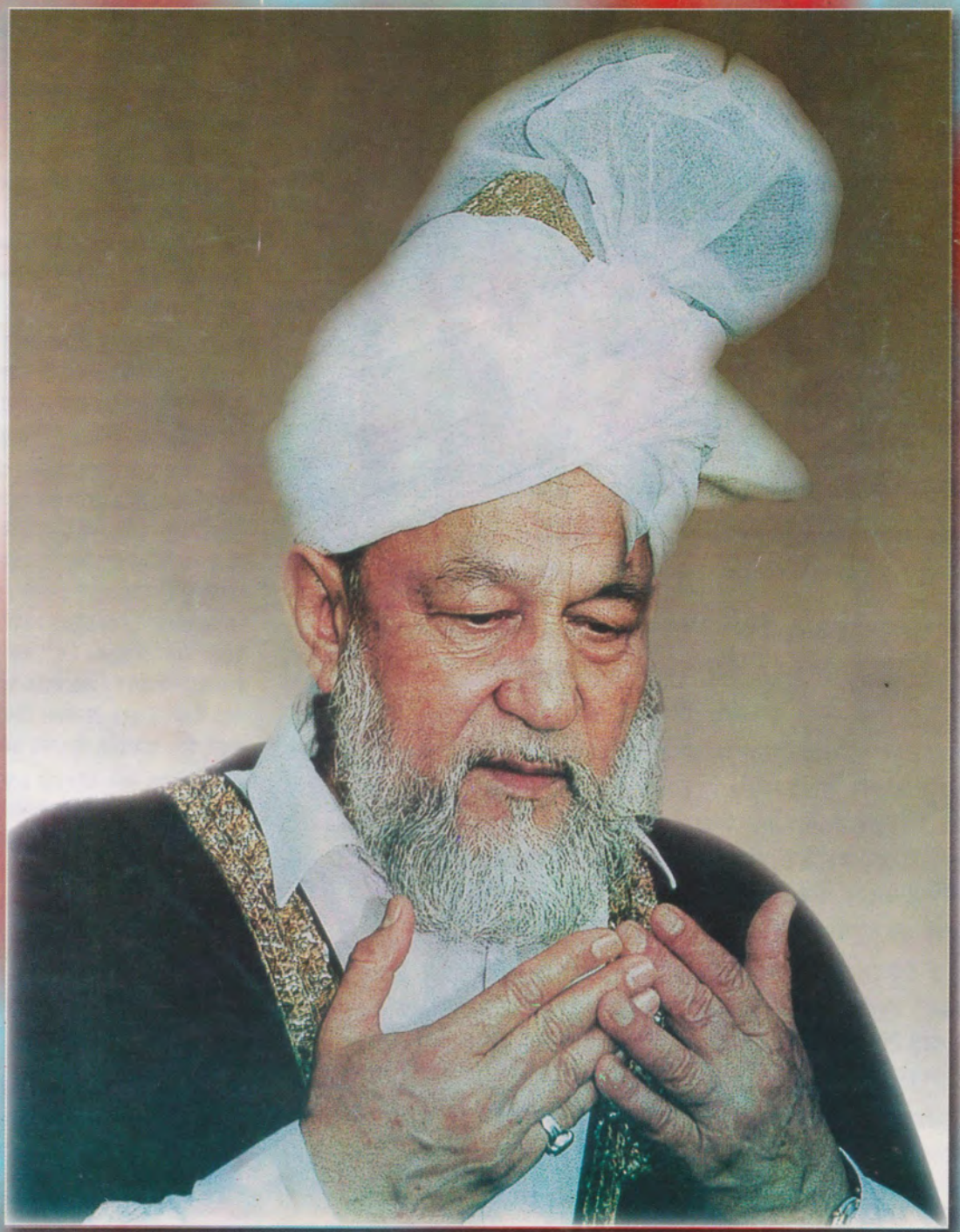

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

১৯৯৭ সনে যুক্তরাজ্যের ৩২তম সালানা জলসায় উদ্বোধনী ভাষণের প্রাক্কালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) আহমদীয়তের পতাকা উত্তোলন করছেন।

চতুর্থ খেলাফতের বিশ বছরের বিশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা

১৯৮২ খৃষ্টাব্দ

জুন-১০ ঃ রোজ বৃহস্পতিবার যুহরের নামাযের পরে রাবওয়ার মসজিদে মুবারকে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) কর্তৃক নিয়োজিত মজলিসে ইন্তেখাবে খেলাফত (খেলাফতের নির্বাচক-মন্ডলী)-এর সভা সাহেবযাদা মির্যা মুবারক আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে ঐশী আকাঙ্ক্ষানুযায়ী হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' [হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চতুর্থ খলীফা] হিসেবে নির্বাচিত হন।

জুলাই-২৮ ঃ খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে প্রথমবারের মত ইউরোপ ভ্রমণে গমন করেন। এ ভ্রমণের সময় ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি ৭৫০ বছর পরে স্পেনের দূরবর্তী কর্ডোভার নিকটে মসজিদে বাশারতের শুভ উদ্বোধন করেন।

অক্টোবর - ২৯ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) 'বুযুতুল হামদ'-এর তাহ্রীক করেন।

(অবশিষ্টাংশ ১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মুসলমানদের আদেশ দিয়েছেন ঃ 'ফা ইযা রায়ায়তুমুহু ফাবায়েউহু ওয়ালাও হাবওয়ান আলাস্ সালজি ফা ইন্নাহু খলীফাতুল্লাহিল মাহদিউ' অর্থাৎ যখন তোমরা তার [অর্থাৎ ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর] সন্ধান পাবে তখন তার বয়াত করবে যদিও বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্র খলীফা আল্ মাহ্দী [সুনান ইবনে মাজাহ্ - বাব খুরুজিল মাহ্দী]।

দু'টি কথা এখানে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমটি হলো স্বয়ং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে মানার জন্যে। সুতরাং ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে মান্য করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক।

দ্বিতীয় ঃ 'বয়াত' কথাটি হলো নিজেকে বিক্রি করা। সাধারণ কোনো নায়েবে রসূল বা পীর-মুর্শেদের কাছে কোন মুসলমানকে বিক্রি হতে বলা হয় নি। হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর হাতে 'বয়াত' (বিক্রি) হতে বলা হয়েছে। এতদ্দ্বারা তিনি যে কত বড় আধ্যাত্মিক মর্যাদার অধিকারী একথা তাঁর কাছে বয়াতের নির্দেশের মাধ্যমে সহজেই প্রতীয়মান হয়।

সুতরাং মুসলমানদের উচিত যুগের আলামত ও নিদর্শন যাচাই করে প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে মান্য করা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত খিলাফতের রজ্জু শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা।

আর আমরা যারা ইমাম মাহদী (আঃ)-কে মেনে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্য হয়েছি তাদের উচিত বয়াতের তাৎপর্য উপলব্ধি করা। আমরা নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছি মহান আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট ইমামের হাতে। এখন তিনি যা বলবেন তা মানতে হবে। সেভাবেই আমাদের জীবন গড়তে হবে। বয়াতের দশটি শর্ত হলো খাঁটি ইসলামের সারাংশ। এগুলোকে মনোযোগ দিয়ে পড়ে উপলব্ধি করে দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়ন করাই হবে আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য।

একদল লোক বলে, আহমদী হলে মানুষ নাকি কাফির হয়। প্রকৃতপক্ষে আহমদী হবার দশটি শর্ত মানলে মানুষ আল্লাহ্র ওলীতে রূপান্তরিত হয়। আল্লাহ্তাআলা আমাদের প্রত্যেককে ওলীউল্লাহ্ হবার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

যে আহমদী নিজ জীবনে বয়াতের দশটি শর্ত পূর্ণ করে সে 'মূর্তিমান তবলীগে' পরিণত হয়। সে কথা না বললেও তার আচার-আচরণ ও জীবন মানুষকে আকৃষ্ট করতে বাধ্য। সুতরাং তবলীগের ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্যও বয়াতের শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। আল্লাহ্ আমাদের তৌফীক দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৪ বর্ষ ॥ ২৩তম সংখ্যা

১ আষাঢ় ১৪০৯ বঙ্গাব্দ ৩ রবিউস সানী ১৪২৩ হিঃ কাঃ

১৫ ইহসান ১৩৮১ হিঃ শাঃ ১৫ জুন, ২০০২ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ♦ ভারত টাঃ ২০০ ♦ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	-	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	-	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	-	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড
ফকির আব্দুস সাত্তার	-	সিঙ্গাপুর

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫

E-mail : amgb@bol-online.com

সম্পাদকীয়

তা'লীম-তরবিয়তের সফলতায় ওয়াকফে আরযীর গুরুত্ব

বয়াতের ক্রমাগত প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে তা'লীম ও তরবিয়তের চাহিদাও যে বেগবান হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু প্রয়োজনের চাহিদা মেটানোর মত মুরব্বী ও মোয়াল্লেম জামাতের হাতে নেই অথচ নবীদিক্ষীত (নও মুবায়েঈন)-দের সঠিক তা'লীম-তরবিয়ত না দিতে পারলে এবং তাদেরকে সঠিক আহমদীয়তের রঙ্গে রঙ্গীন করতে না পারলে এ বয়াত দ্বারা আরব্ধ সফলতাতো লাভ হবেই না বরং আত্মবিধ্বংসী উপকরণে মাত্রা যোগ করা হবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) ১৯৬৬ সনের ১৮ই মার্চ তারিখে ঐশী ইঙ্গিতে জামাতের অভ্যন্তরীণ তা'লীম ও তরবিয়তের কাজে প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি এবং আত্ম-শুদ্ধির জন্যে এক ঐতিহাসিক তাহরীক করেন যার নাম 'ওয়াকফে আরযী' অর্থাৎ সাময়িক উৎসর্গ। এ তাহরীকের ঘোষণা করতে গিয়ে হুযূর আকদস (রাহেঃ) বলেন, "আহবাবে জামাত আর্থিক কুরবানীর পথে দিন দিন উন্নতির দিকে পা বাড়াচ্ছেন। এখন তাদের সময়েরও কুরবানীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। এতে সন্দেহ নেই যে, এখনও জামাতের একটা অংশ সময়ের কুরবানী করে যাচ্ছে। আমি জামাতের নিকট এ তাহরীক করছি যে, যেসব বন্ধুকে আল্লাহ্ সামর্থ্য দিয়েছেন বছরে তারা যেন দু'সপ্তাহ থেকে ছ'সপ্তাহ পর্যন্ত সময় ধর্মের সেবার জন্যে উৎসর্গ করেন এবং নিজেদেরকে জামাতের বিভিন্ন কাজে যেখানে প্রেরণ করা হয় সেখানে গমন করেন। নিজ খরচে গমন করেন এবং যতদিন সেখানে থাকেন নিজ খরচে জীবন নির্বাহ করেন।" ওয়াক্ফকারীর কাজের ধরন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "এর মধ্যে কাজ তো হলো কুরআন করীম নাযেরা এবং তরজমাসহ পড়ার যে অভিযান জামাত থেকে চালানো হচ্ছে তিনি যেন তার তদারকী করেন, একে সঠিক রূপ দান করেন।" এ কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে গিয়ে হুযূর আকদস (রাহেঃ) বলেন, "এই কাজ বড়ই গুরুত্বপূর্ণ এবং দরকারী আর এর দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করা জরুরী। কেননা, বহু জামাত এমন রয়েছে যেখানে দুর্বলতা বিদ্যমান অথবা আমার এভাবে বলা উচিত যে, তাদের এক অংশের মধ্যে এক সীমা পর্যন্ত দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে। ঐ দুর্বলতা দূর করা এবং সত্বর দূর করা আমাদের প্রথম কর্তব্য। আমরা তবলীগের মাধ্যমে নতুন আহমদী বানাতে থাকব। কিন্তু তরবিয়তের প্রতি দৃষ্টি না দেয়ার ফলে যদি পুরোনো এবং নতুন আহমদী প্রজন্মকে দুর্বল হওয়ার সুযোগ দিই তাহলে আমাদের শক্তি এত বৃদ্ধি পেতে পারে না, যতটুকু এ অবস্থায় বৃদ্ধি পেতে পারে যখন জন্মগত আহমদী পুরাতন আহমদী এবং নতুন আহমদী আন্তরিকতার উচ্চ ও উন্নত মর্যাদায় ভূষিত হয়।"

খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ)-এর উপরোক্ত তাহ্রীকের পর আজ প্রায় ৪ দশক পাড়ি দিয়ে আমরা এমন এক স্থানে দন্ডায়মান হয়েছি যেখান থেকে আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের বিশ্ব-বিজয় দিগন্তের দিক চক্রবালে প্রত্যক্ষ করছি। আমরা সংখ্যার দিক থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে চলেছি একথা জোর দিয়েই বলা যায়। সাথে সাথে এ কথাকে অস্বীকার করা যায় না যে, জন্মগত ও নব দীক্ষিত আহ্মদীর মধ্যে প্রয়োজন মাফিক তা'লীম ও তরবিয়তের ব্যবস্থা করতে আমরা সক্ষম হই নি। এর অনেক কারণ রয়েছে। বিতন্ডার উর্ধ্বে থেকে বলা যায় যে, তা'লীম ও তরবিয়ত দেয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় লোকের অভাব রয়েছে। এ কথা বোধ করি সকলেই স্বীকার করবেন যে, একদিকে নতুন প্রজন্মের তা'লীম তরবিয়ত অন্য দিকে নতুন দীক্ষা গ্রহণকারীদের তা'লীম তরবিয়তের বিষয়টি সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। একদিন পরেও এ ওয়াকফের প্রয়োজনীয়তাকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। আগেই বলেছি চাহিদার তুলনায় আমাদের হাতে যথেষ্ট সংখ্যক মুরব্বী ও মোয়াল্লেম নেই, তবুও এ কাজ আমাদেরকে করতেই হবে। নচেৎ আমরা বাইরে যত বাড়ব ভিতরে তত হারিয়ে ফেলব। তাই এখন ওয়াক্ফে আরযী পরিকল্পনাকে আরও জোরদার করতে হবে, আরও ব্যাপককতর করতে হবে। আমরা যদি ওয়াক্ফে আরযীর কাজকে সুপরিকল্পিতভাবে সারা দেশে সুসমন্বিত করতে পারি তাহলে আমরা তা'লীম ও তরবিয়তের কাজকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব তাতে কোন সন্দেহ নেই। জামাতের কর্মকর্তা এবং সকল আহমদীর দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করে সময়ের চাহিদা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতঃ স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।

-নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
■ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল আ'রাফ - ৭	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
■ হাদীস শরীফ ঃ অপরের কষ্টে আনন্দিত হওয়া নিষেধ	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - মাওলানা সালেহ আহমদ	৩
■ অমৃত বাণী ঃ খোদাতাআলার ক্ষমতা হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)	ঃ অনুবাদ ঃ জনাব মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা	৪
■ জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্তাআলার 'মু'মিন' সিফতের ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-১০
■ মুলাকাত ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ সংকলন ও অনুবাদ - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	১১-১২
■ চতুর্থ খেলাফতের বিশ বছরের বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার ঝলক	ঃ সংকলন - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৩-১৬
■ মুনাজাতে রসূল (সঃ) মূল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	১৭-১৮
■ যীশুর কবর কাশ্মীরে	ঃ জনাব সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	১৯-২০
■ ছোটদের পাতা ঃ ফুলের তোড়া (গুলদাস্তা) (১০-১৩ বছর বয়সের ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক)	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২১
■ নতুনদের পাতা		
● প্রসঙ্গ ঃ দজ্জাল তার গাধা ও ইয়া'জূজ মা'জূজ	ঃ জনাব জি, এম, ফিরোজ আহমদ	২২-২৭
● খান সাহেব মুন্সী অরোড়ে খান (রাঃ)	ঃ অনুবাদ- কওসার আলী মোল্লা	২৮-৩১
■ সংবাদ	ঃ	৩২

প্রচ্ছদ ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)। ১০ই জুন, ২০০২ তারিখে তাঁর খেলাফতের ২০ বছর পূর্ণ হয়েছে। আমরা তাঁর সুস্থ ও দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি। আল্লাহ্তাআলা তাঁর সমস্ত দোয়া ও পবিত্র আকাঙ্ক্ষা কবুল করুন এবং তাঁর সাথে আল্লাহ্তাআলার যত প্রতিশ্রুতি তা তাঁর জীবদ্দশায় পূর্ণ করে দিন। তাঁর 'বিগত ২০ বছরের খেলাফতকালের বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার ঝলক' অত্র সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো। তিনি (আইঃ) খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রথম বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিলেন, এখন আহমদীয়া খেলাফত স্থায়ী হলো। কোন মানবীয় শক্তি একে আর বিনাশ করতে সক্ষম হবে না।

কালামুল ইমাম

'রিয়া' (লোক দেখানো কাজ ও কথা)

"আত্মশ্লাঘা ও 'রিয়া' অত্যন্ত ভয়ঙ্কর জিনিস। এইগুলি হইতে মানুষের বাঁচা উচিত। মানুষ একটি সৎকর্ম করিয়া লোকদের প্রশংসার আকাঙ্ক্ষী হয়। বাহ্যতঃ ঐ সৎকর্ম ইবাদত, ইত্যাদির আকারে হইয়া থাকে যদ্বারা খোদাতাআলা রাজী হন। কিন্তু প্রবৃত্তির মধ্যে একটি আকাঙ্ক্ষা গোপন থাকে যে, অমুক অমুক লোক আমাকে ভাল বলুক। ইহার নাম "রিয়া" (মলফুযাত, খন্ড ৬, পৃঃ ৩৩৫)।

"মু'মিনের পরিপূর্ণতা ইহা যে, সে কখনো পসন্দ করে না তাহার সহিত খোদাতাআলার যে সম্পর্ক আছে অন্যেরা তাহা জানুক। বরং কোন কোন সুফী লিখিয়াছেন যে, যখন মু'মিন খোদাতআলার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও ভালবাসার দরুন গোপন নিভৃতে তাহার মুনাজাত করে ঐ সময় যদি কেহ তাহাকে দেখিয়া ফেলে তবে ইহাতে সে খুব লজ্জিত হয়, যেভাবে কোন ব্যভিচারী ঠিক ব্যভিচারের সময় পাকড়াও হয়। অতএব 'রিয়া' হইতে বাঁচা উচিত এবং নিজের সকল কথা ও কাজকে ইহা হইতে সংরক্ষণ করা উচিত" (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭০, নূতন এডিশন)।

কুধারণা

"কুধারণা এইরূপ একটি ব্যাধি এবং এইরূপ সাংঘাতিক বিপদ, যাহা মানুষকে অন্ধ করিয়া ধংসের অন্ধ কুপে ফেলিয়া দেয়। কুধারণাই একজন মৃত ব্যক্তির পূজা করাইল। কুধারণাই লোকদিগকে খোদাতাআলার সৃজন, দয়া, রিযক দান ইত্যাদি গুণাবলীকে রহিত করিয়া, নাউযুবিল্লাহ্, পরিত্যক্ত ব্যক্তি ও বস্তুর ন্যায় অর্থহীন করিয়া দেয়। মোট কথা, এই কুধারণার দরুন জাহান্নামের খুব বড় অংশ যদি বল পুরা অংশ ভরিয়া যাইবে, তবে অতিশয়োক্তি করা হইবে না। যে সকল লোক আল্লাহ্তাআলার প্রত্যাদিষ্টগণ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করে তাহারা খোদাতাআলার পুরস্কার ও তাঁহার 'ফযল' (আশীষ)-কে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে" (মলফুযাত, খন্ড ১, পৃঃ ৬২, নয়া এডিশন)।

"আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, কুধারণা খুবই সাংঘাতিক বিপদ, যাহা মানুষের ঈমানকে ধ্বংস করিয়া দেয়, সততা ও সত্যবাদিতা হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দেয়, এবং বন্ধুদিগকে দুশমন বানাইয়া দেয়। সত্যবাদীদের গুণাবলী অর্জন করার জন্য মানুষকে কুধারণা হইতে একান্তভাবে বাঁচিয়া থাকা জরুরী। যদি কাহারো সম্পর্কে কোন কুধারণা সৃষ্টি হয় তবে বেশি বেশি করিয়া 'ইস্তিগফার' কর এবং খোদাতাআলার নিকট দোয়া কর যেন এই বিপদ ও ইহার কুফল হইতে বাঁচিয়া যাও, যাহা এই কুধারণার পশ্চাতে আগমনকারী। ইহাকে কখনো সাধারণ ব্যাপার মনে করা উচিত নহে। ইহা খুবই বিপজ্জনক ব্যাধি, যদ্বারা মানুষ খুব তাড়াতাড়ি ধ্বংস হইয়া যায়। মোট কথা, কুধারণা মানুষকে ধ্বংস করিয়া দেয়। এমনকি লেখা আছে যে, যখন দোযখী লোকদিগকে জাহান্নামে ফেলা হইবে তখন আল্লাহ্তাআলা তাহাদিগকে এই কথাই বলিবেন, তোমরা আল্লাহ্তাআলা সম্পর্কে কুধারণা করিয়াছ" (মলফুযাত, খন্ড ১, পৃঃ ২৪৬, ২৪৭)।

মজলিসে সূরা সম্পন্ন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ২৪তম মজলিসে শূরা বিগত ৭-৮ জুন, ২০০২ আল্লাহ্তাআলার ফযলে সুসম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

- আহমদী বার্তা

সূরাতুল আ'রাফ - ৭

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ﴿١١٦﴾

১১৬। তারা বললো, 'হে মূসা! তুমি কি (প্রথমে) নিক্ষেপ করবে না আমরাই নিক্ষেপকারী হবো।'[১০২৭]

قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ﴿١١٧﴾

১১৭। সে বললো, 'তোমরাই নিক্ষেপ[১০২৮] কর'। অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করলো তখন তারা লোকদের চোখে যাদু করলো ও তাদেরকে ভীতি-বিহ্বল করে ফেললো এবং তারা বিরাট এক যাদু উপস্থাপন করলো।

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿١١٨﴾

১১৮। এবং আমরা মূসার প্রতি ওহী করলাম, 'তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর' তখন দেখ যা তারা ভেল্‌কিরূপে উপস্থাপন করছিল তৎক্ষণাৎ তা গিলে ফেলতে লাগলো।[১০২৯]

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٩﴾

১১৯। অতএব তখন সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো ও তারা যা করেছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হ'ল।

فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২০। তখন তারা সেখানে পরাস্ত হলো ও পরিণামে লাঞ্ছিত হ'ল[১০৩০]

وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢١﴾

১২১। আর যাদুকররা সিজদায়[১০৩১] পড়তে বাধ্য হলো।

قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٢﴾

১২২। তারা বললো, আমরা বিশ্ব-জগতের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম,

১০২৭। দৃশ্যের তীব্র লক্ষণীয়- উভয় পক্ষ চূড়ান্ত ফয়সলার প্রতিযোগিতায় একে অপরের বিরুদ্ধে বিষম দ্বন্দ্বে রত হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে সজ্জিত করলো।

১০২৮। আল্লাহ্‌তাআলার নবীগণ কখনও প্রথম আক্রমণ করেন না। তাঁরা বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণের অপেক্ষা করেন, কারণ তাঁরা আক্রমণকে প্রতিহত করাই পসন্দ করেন এবং ঐশী সাহায্যের প্রতীক্ষায় থাকেন।

১০২৯। যষ্টি "সর্প" হয় নি, কিন্তু যষ্টি নিজেই ঐন্দ্রজালিকের ধোঁকাবাজী বা ভেল্‌কী নস্যাৎ করেছিল। হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠি এক মহান নবীর আধ্যাত্মিক শক্তিতে নিয়ন্ত্রিত এবং আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশে নিক্ষেপিত হয়ে দর্শকদের ওপর যাদুকরদের কুহকী ক্রিয়া-কলাপ প্রকাশ করে দিল এবং যাদুর প্রভাবের ফলে দর্শকগণ যাকে প্রকৃতই সর্প বলে ভেবেছিল তাকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। "তখন দেখ সহসা তা গিলে ফেলতে লাগলো" উক্তির মর্মার্থ- যাদুকরদের ধোঁকাবাজী বা প্রতারণাকে যষ্টি ফাঁস করে দিল। "গিলে ফেলতে" কথার মর্ম, তাদের "ভেল্কির প্রভাব বা প্রতিক্রিয়াকে ধ্বংস করে দিল"।

১০৩০। এই আয়াত ফেরাউনের দলের প্রতি ইঙ্গিত করছে বলে মনে হয়, যাদুকরদের প্রতি নয়। কেননা, যাদুকরদের কথা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। "হেয়" এই শব্দটি ঐ সকল ব্যক্তির সম্বন্ধে ব্যবহৃত হতে পারে না, যারা সত্যের প্রতি পরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিল- এমন কি তারা সত্য গ্রহণের পূর্বে, ফেরাউন কি বলে তা জানবার বা বুঝবার জন্য একটুও অপেক্ষা করে নি। এর প্রকৃত অর্থ এই যে, যারা (অর্থাৎ ফেরাউন এবং সমর্থক দল) কিয়ৎক্ষণ পূর্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থলে গর্বিত ও উদ্ধত মনোভাব সহকারে নিশ্চিত বিজয়ের আশা নিয়ে এসেছিল, তারা এক্ষণে অপদস্থ ও মন-মরা হয়ে (মাথা নত করে) ফিরে গেল।

১০৩১। ঐন্দ্রজালিকদের বিহ্বলতা এতই চরমরূপে ছিল যে, তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছিল, অদৃশ শক্তি তাদের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে নিয়ে গেল। তারা যেন মাটির উপরে আল্লাহ্‌তাআলার উদ্দেশ্যে বিনয়ের সাথে প্রার্থনার জন্য সিজদায় পড়ে গেল।

হাদীস শরীফ

অপরের কষ্টে আনন্দিত হওয়া নিষেধ

কুরআন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾

অনুবাদ - যারা এ কামনা করে যে মু'মিনদের মধ্যে নির্লজ্জতা বিস্তার লাভ করুক তাদের জন্যে নিশ্চয় ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক আযাব আছে। এবং আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জান না (সূরাতুন্ নূর ঃ ২০)।

হাদীস ঃ

আন ওয়াসেলাতাবনেল আসকায় ক্বালা ক্বালা রসূলুল্লাহে সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা লা তুযহেরিশ শামাতাতা লে আখীকা ফাইয়ার হামাহুল্লাহু ওয়া ইয়াবতালীকা

অর্থাৎ ওয়াসেলাতাবনেল আসকা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার ভাইয়ের বিপদে আনন্দিত হয়ো না। কেননা, এতে আল্লাহ্ তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং তোমাকে ঐ বিপদে নিপতিত করবেন (তিরমিযী)।

ব্যাখ্যা ঃ

ইসলাম শান্তির ধর্ম। গোটা পৃথিবীর মানুষকে শান্তির নীড়ে একত্র করতে চায়। এর জন্য প্রয়োজন এমন মৌলিক শিক্ষা যা অনাচার অত্যাচার ও অমানবীয় বিষয়গুলিকে সমূলে উৎপাটন করে, ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্যও তাই যে, মানবীয় চরিত্রের ঐ সকল দুর্বল বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করে প্রতিকারের পথ বলে দিয়েছে যা ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়। আর যে ঐ শিক্ষাকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করবে তার আত্মার অনেক ব্যাধি সমূলে উৎপাটিত হবে।

পবিত্র কুরআন সতর্ক করছে, যারা মু'মিনদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে ছড়িয়ে দিতে চায় তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। বস্তুত মানুষের চরিত্র এমন যে, সে কারো কোন দোষ-ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখে তবে সে তা বলে বেড়াতে শুরু করে। তার এই বলা প্রমাণ করে যে, সে নিজেকে তার চেয়ে শ্রেয় মনে করেছে এবং তার দোষ-ত্রুটি বা দুর্বলতা তাকে আনন্দ দিয়েছে তাই সে অপরকে বলে বেড়িয়ে আনন্দ পায়।

আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) সাবধান করেছেন, অপরের কষ্টে আনন্দ হবার কিছু নেই। যদি এরূপ কর তবে তোমরাও অনুরূপ কষ্টে নিপতিত হবে। আসলে অপরের দোষ-ত্রুটিও

তার জন্য এক ধরনের কষ্ট। সে চেষ্টা করেও হয়তো তা দূর করতে পারছে না; কিন্তু হৃদয়ে অনুশোচনা আছে। অনুরূপভাবে যার বোধ শক্তি মরে গেছে এ-ও এক ধরনের কষ্ট। বস্তুত মানবতার শিক্ষা হলো যা মানুষকে বিচলিত করে এর জন্য ইস্তিগফার করা উচিত। হুযূর নবী করীম (সঃ) বলছেন, অপরের কষ্টে আনন্দিত হলে ঐ বিপদে তুমিও পড়বে। তাই হুযূর (সঃ)-এর জীবনে আমরা দেখতে পাই যখনই তিনি কাউকে কষ্টে দেখতেন তখনই তিনি (সঃ) দোয়া করতেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে ঐ বিপদ হতে রক্ষা করেছেন যাতে সে নিপতিত হয়েছে এবং তিনি আমাকে আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।" এই দোয়া করার পর তিনি তার জন্য দোয়া করতেন ও তাকে সাহায্য করতেন ইস্তিগফার করতেন।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) বলেছেন, তোমরা যদি চাও তোমাদের দোয়া কবুল হোক তবে তোমরা অপরের জন্য দোয়া কর। আসলে অপরের কষ্টে হৃদয়ে বেদনার সৃষ্টি হওয়া তার প্রকৃত মানুষ হওয়াকে প্রমাণ করে। আজ গোটা বিশ্বে মানুষ কষ্টে আছে আমাদের এতে আনন্দের কিছু নেই, শত্রুও বিপদে পড়েছে এতেও আনন্দ নেই। বরং এটা ভয়ের বিষয় যে, খোদার দৃষ্টিতে যেন আমি কখনও ঐরূপ না হই। আমাদের উচিত আমরা যেন সকল কষ্টে পড়া মানুষের জন্য দোয়া করি যেভাবে হুযূর নবী করীম (সঃ) করে গেছেন। এভাবে দোয়া করলে তারাও বিপদ হতে বাঁচবে এবং আমাদেরও বিপদ দূর হবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে সকলের জন্য দোয়া করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - **মাওলানা সালেহ্ আহমদ মুরব্বী সিলসিলাহ্**

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

খোদাতাআলার ক্ষমতা ও বিষয়াবলীকে সীমিত জ্ঞান করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয় ঃ

খোদাতাআলার ক্ষমতা ও বিষয়াবলীকে সীমিত জ্ঞান করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। তারা নিজেদের অন্তর্নিহিত বিষয় জানে না বুঝেও না, কিন্তু ঐশী বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে থাকে।

মানুষের উচিত তার সাধ্যের বাইরে কোন কাজ করতে না যাওয়া। অধিকাংশ রোগের কষ্টের কারণ ও লক্ষণ ডাক্তারও নির্ধারণ করতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে এরূপ দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তার পক্ষে সীমা লঙ্ঘন করাটা কি উচিত হবে? কখনো না। বরং নিষ্ঠাপূর্ণ উপাসনার এটাই রীতি যে, তাকে ঐ সকল লোকদের অন্তর্গত হতে হবে যারা বলেন- "পবিত্র প্রভু-তুমি সর্বজ্ঞ আমরা অজ্ঞ।"

দেখো! তারকারাজি এত বিরাট আকারে বল হওয়া সত্ত্বেও বিনা স্তম্ভে শূন্যে ঝুলে আছে, এবং স্বয়ং আকাশ কোন অবলম্বন ছাড়াই হাজার হাজার বছর ধরে এভাবেই চলে আসছে; প্রতিদিনই চাঁদ পরিবর্তিত হয়ে বের হচ্ছে; সূর্য প্রতিদিন উদিত হচ্ছে এবং সঠিক গতি ও নিয়মে চলছে। আমাদের কাজ-কর্মে কোন না কোন ভুল-ত্রুটি অবশ্যি ঘটে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলার কর্মকে লক্ষ্য কর- এ চাঁদ-সূর্য একই নিয়মে নিজেদের গতি পথে চলছে এবং প্রত্যহ এ বিষয় চিন্তা করে দেখো যে, সূর্য প্রতিদিন নির্দিষ্ট নিয়মে উদিত হচ্ছে এবং দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে- তাহলে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটবে! দেখ আমাদের মধ্যে অবস্থার কত রকম পরিবর্তন ঘটে থাকে- কিন্তু সূর্যের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটে না। দু'হাজার টাকার একটি ঘড়ি যদি ১২টার স্থলে ১০টা এবং ১০টার বদলে ১২টার সংকেত দেয় তাহলে এটাকে অকেজো ও বাতিল মনে করা হবে। কিন্তু খোদাতাআলার প্রতিষ্ঠিত ঘড়ি এরূপ যে, এতে অণুপরিমাণও পরিবর্তন ঘটে না। এতে কোন চাবি দেয়ার প্রয়োজন হয় না এবং একে পরিষ্কার করতেও হয় না। এরূপ স্রষ্টার ক্ষমতা ও কৌশলের গণনা করা কি সম্ভব?

মানুষ বিচলিত হয়ে যায় যখন দেখে যে, নিজেদের ব্যবহারের জিনিসপত্র কাপড়, হাঁড়ি-পাতিল, থালা বাসন ইত্যাদি দিন দিন ক্ষয় হতে থাকে; শিশু যুবক ও বৃদ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে; কিন্তু গতকাল যে সূর্য উদিত হয়েছিলো আজও সেই সূর্যই আছে। এবং এক অগণিত কাল থেকে এভাবে চলে এসেছে, এবং চলতে থাকবে; কিন্তু এর ওপর ক্ষয়ে যাওয়া বা বিলীন হওয়া ইত্যাদি অবাস্তব অথবা কালের প্রভাব পড়ে না। এটা কীরূপ ঔদ্ধত্য যে, একটি কীট হয়ে সেই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উপাস্যের প্রতি আক্রমণ চালায় এবং তৎক্ষণাৎ আদেশ জারি করে দেয়, "খোদার মধ্যে কোন শক্তি নেই।"

ইসলামের খোদা অতীব ক্ষমতাবান, তাঁর ক্ষমতা সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপনের কারো অধিকার নেই ঃ

নবীগণের অলৌকিকতার কারণ ঃ

নবীগণ (আঃ)-কে অলৌকিকতা দান করা হয়ে থাকে। এর কারণ হলো- মানুষের অভিজ্ঞতা এটাকে চিহ্নিত করতে সক্ষম নয়। এবং যখন মানুষ এই অপ্রাকৃতিক বিষয়কে প্রত্যক্ষ করে, তখন সে একবার তো এ কথা বলতে বাধ্য হয়ে যায় যে, তা খোদাতাআলার পক্ষ থেকে হয়েছে। কিন্তু যদি সে নিজের জ্ঞানকে প্রাধান্য দেয় এবং ঐশী পাঠাগারের গলিতে পদচারণা না করে, তাহলে দু' দিক থেকেই তার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। এক দিকে, অলৌকিকতাকে অস্বীকার আর অপর দিকে, অপরিপক্ক জ্ঞানের দাবী- যার পরিণাম এই দাঁড়ায় যে, এই অর্বাচীন সেই সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিষয়টি যা অলৌকিকতার গভীরে নিহিত তার সন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করবে। পার্থিব জ্ঞান ও কাল্পনিক ধারণা এ দর্শনকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে না। ফলে সে অস্বীকারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ক্রমে ক্রমে নবুওয়তের সত্তারই বিরোধী হয়ে যায় এবং সন্দেহ ও কুধারণার এক বিরাট ভান্ডার গড়ে তুলে পরিণামে তা তার লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কখনও একথা বলে ফেলে যে- 'সে-ও তো আমারই মত একজন মানুষ যার ক্ষুধা পিপাসা, ও অভাব-অনটন রয়েছে, তাহলে কীভাবে সে আমার চেয়ে অধিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে? তার শক্তিতে আধ্যাত্মিকতার তেজ ও তার দোয়া গৃহীত হওয়ার নিদর্শন বিশেষভাবে প্রকাশিত হবার কারণ কি? আফসোস! সে ব্যক্তি এ ধরনের কথা তৈরী করছে ও আপত্তি উত্থাপন করছে যার ফলে সে নবুওয়তের সত্তাকেই অস্বীকার করে বসে, যে কথা আমি এখনই বলে এসেছি। (মলফূযাত প্রথম খন্ড)।

(চলবে)

অনুবাদ - **মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা**

আল্লাহ্‌তাআলার গুণবাচক নাম 'মু'মিন' সম্পর্কে বড় তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআউয, ও সূরা ফাতিহা পাঠ করে হুযূর (আইঃ) খুতবা এরশাদ করেছেন।

আমি এখনও বলেছি, ইতঃপূর্বেও এমন আঘাত কোন কোন সময় পেয়েছি, একবার তো স্কোয়াশ খেলতে গিয়ে খুব বেশি আঘাত পেয়েছিলাম। আমি সর্বদা চেষ্টা করি যেন নামাযে উপস্থিত থাকতে পারি, অনুপস্থিত না হই, বিশেষ করে জুমুআর খুতবা যেন বিঘ্নিত না হয়। কারণ এতে করে মানুষ বড় কষ্ট বোধ করে, ফলে তাদের কষ্টের কারণে আমারও কষ্ট হয়। তাই আপনারা চিন্তা করবেন না এবং এয়াদত (অর্থাৎ কোন অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর করতে এবং তাকে দেখতে যাওয়া) করবেন না। কেবল দোয়া করবেন। যারা এখান থেকে দূরে খুতবা দেখছেন তারাও এ সম্পর্কে পত্র লিখে এয়াদত করবেন না। আমার যে আঘাত লেগেছে এটা ঠিক হয়ে যাবে, ইনশাল্লাহ্।

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤١﴾

অনুবাদ ঃ নিশ্চয় যারা আমাদের আয়াত সম্পর্কে বক্র দৃষ্টিভঙ্গি রাখে, তারা কখনও আমাদের অগোচরে নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে সে কি উত্তম অথবা যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন শান্তির সাথে আমাদের কাছে আসবে (সে উত্তম?) তোমরা যা চাও করতে থাক; তোমরা যা কিছু করছ নিশ্চয় তিনি তার উপর দৃষ্টি রেখেছেন (সূরা হামীম আস্‌সিজদাহ্ঃ ৪১)।

হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) একটি দীর্ঘ হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন যার শেষভাগে আছে, "... কিয়ামতের দিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, প্রত্যেক উম্মত (ধর্মীয় গোষ্ঠী) তার পেছেনে দাঁড়াবে যার ইবাদত তারা করত। এ ঘোষণা শুনে যারা প্রতিমা পূজা বা অন্য কিছুর পূজা করত তারা সবাই এক এক করে আগুনে পড়তে থাকবে। কেবল যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করত তারা বাকী থাকবে। এদের মধ্যে ভাল মন্দ সবাই থাকবে। আহলে কিতাবিদের মধ্যে যারা থাকবে তাদের মধ্য থেকে প্রথমে ইহুদীদেরকে ডাকা হবে। তাদের জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কার ইবাদত করেছিলে? তারা বলবে, আমরা উযায়েরের ইবাদত করেছি যিনি আল্লাহ্‌র পুত্র। তাদের বলা হবে, তোমরা মিথ্যুক! আল্লাহ্ না কোন স্ত্রী রেখেছেন, না কোন সন্তান! এখন তোমরা কি চাও? তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের খুব পানির তেষ্টা পেয়েছে, পানি দাও। তখন তাদের বলা হবে, 'তোমরা অমুক ঘাটে চলে যাও না কেন? তাদের আগুনের নিকট একত্র করা হবে তারা মরিচীকার মত দেখবে এবং কেউ কোন অংশ ভাংতে শুরু করবে, কেউ কোন অংশ। এভাবে তারা উপর নীচে স্তরে স্তরে পড়তে থাকবে।

তারপর খৃষ্টানদেরকে ডাকা হবে। তাদের জিজ্ঞেস করা হবে তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা ঈসা মসীহ্‌র ইবাদত করতাম। যিনি হচ্ছেন আল্লাহ্‌র পুত্র। উত্তরে তাদের বলা হবে, তোমরা মিথ্যুক! আল্লাহ্ তো কোন স্ত্রী-পুত্র গ্রহণ করেন নি। তারপর তোমরা এখন কী চাও? তারপর তাদের সাথে ঐরূপ ব্যবহার করা হবে যা পূর্ববর্তী গোষ্ঠীর সাথে করা হয়েছিল।

তারপর কেবল এমন লোকেরা থেকে যাবে যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করত। যাদের মধ্যে পুণ্যবান ও পাপী উভয় প্রকার মানুষ থাকবে। তাদের সামনে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন আসবেন এমন চেহারা নিয়ে যে, প্রায় ঐ ধরনের চেহারা তারা পূর্ব্বেও দেখেছিল।"

আল্লাহ্‌কে বাহ্যিকভাবে, বাস্তবে দেখা তো কখনই সম্ভব না। কিন্তু আল্লাহ্ বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্নভাবে, কোন না কোনভাবে অবশ্যই দেখা দেন। কখনও তিনি অতি মহান অতি উচ্চ সত্তা হয়ে, আবার কখনও বা এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্ত পর্যন্ত আলোর আকারে দেখা দেন। অতএব এমন হাদীসকে বাহ্যিকভাবে নিতে হয় না। অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ অবস্থা ও যোগ্যতা মতে আল্লাহ্‌কে দেখে। অর্থাৎ পুণ্যবান ব্যক্তিরা নিজ খোদাকে দেখেন এবং যখন আল্লাহ্‌কে তারা দেখে তখন সেটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে খাস রহমতস্বরূপ হয়ে থাকে।

"তারপর তাদেরকে বলা হবে তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ? প্রত্যেক উম্মত তার নিজ নিজ উপাস্য, তারা যার ইবাদত করত, তার পেছনে এসে যাও। একথা শুনে তারা বলবে, আমরা পৃথিবীতে ওসব লোকদের পরিত্যাগ করেছিলাম যখন আমাদের খুব প্রয়োজন ছিল তাদের, আমরা তাদের সঙ্গী হই নি। আজও আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের অপেক্ষা করছি। তখন রব্বুল আলামীন বলবেন, আমিই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তখন তারা চলবে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করি না। তারা দুই বা তিনবার বলবে" (সহী বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)।

হযরত আমরিব্‌নেল হাক্ বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, কোন মু'মিন যদি কাউকে 'আমান' (নিরাপত্তা) প্রদান করে থাকে তারপর যদি সে ঐ আশ্রিত ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকব।

হযরত আবূ রাফে' (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আঁ হযরত (সঃ) আমাকে, হযরত যুবায়েরকে এবং মেকদাদ বিন আল্ আসওয়াদকে পাঠিয়েছিলেন এই বলে, 'তোমরা যাত্রা কর, রওযায়েখাখ্ নামক স্থানে পৌঁছে দেখবে যে, এক উটের উপর হওদাজের (হওদাজ ঃ উটের পিঠে পালকির মত মহিলাদের বসার স্থান)-এর মধ্যে একজন মহিলা, যার কাছে একটি চিঠি আছে, ঐ পত্রখানা নিয়ে আসবে।' আমরা ঘোড়া দৌড়িয়ে যাত্রা করলাম। আমরা ঐ মহিলাকে পেয়ে গেলাম এবং তাকে বললাম, সে যেন চিঠিখানা বের করে দেয়। কিন্তু ঐ মহিলা অস্বীকার

করল। সে বলল, তার কাছে কোন চিঠি নেই। আমরা বললাম, তুমি অবশ্যই পত্র বের করে দিবে, নতুবা আমরা তোমার পোশাক কাপড়-চোপড়ের মধ্যে নিজেরাই খোঁজ করতে বাধ্য হব। তখন ঐ মহিলা বাধ্য হয়ে মাথার চুলের খোঁপার মধ্য হতে ঐ চিঠি বের করে দিল। আমরা ঐ চিঠি এনে আঁ হযরত (সঃ)-কে দিলাম। এ চিঠিখানা হাতেম বিন আবি বলতা মক্কার মুশরিকদের নামে লিখেছিলেন। এর মাধ্যমে আঁ হযরত (সঃ)-এর গোপন কিছু তথ্য প্রকাশ করা হয়েছিল। আঁ হযরত (সঃ) হাতেমকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কি করেছ? হাতেম বললেন, হুযূর! আমার বিষয়ে তাড়াতাড়ি ফয়সালা দিবেন না, আমার কথা শুনবেন। ঘটনা এই যে, মক্কার কুরাইশদের সাথে আমার খাস সম্পর্ক রয়েছে যদিও আমি তাদের দলভুক্ত নই। আপনার সাথে যারা মুহাজেরীন আছেন তাদেরও অনেকের আত্মীয়তা ও বিভিন্ন সম্পর্ক মক্কাবাসীদের সাথে আছে, এভাবে তারা তাদের পরিবার-পরিজন, বিষয়-সম্পদের দেখা শোনা ও হেফাযত করতে পারেন। আমার মনে ধারণা জন্মেছিল যে, কুরায়েশদের সাথে আমার কোন বংশগত সম্পর্ক নেই। তবুও আমি এই পত্র মাধ্যমে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি, এতে করে তারাও আমার আত্মীয় -স্বজনের হেফাযত করবে। আমি কুফরী বা ইরতেদাদ (অর্থাৎ ইসলামকে পরিত্যাগ করে ফিরে যাওয়া)-কে গ্রহণ করি নি।' হুযূরে আকরম (সঃ) বললেন, 'হ্যাঁ, সে সত্য কথাই বলেছে।' হযরত উমর (রাঃ) বলে উঠলেন, 'হুযূর আমাকে অনুমতি দিবেন, আমি এই মুনাফিকের ঘাড়ের উপর থেকে তার মাথা নামিয়ে ফেলি'! আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'সে বদরের যুদ্ধে আমাদের সঙ্গে শামীল হয়ে যুদ্ধ করেছে। তোমরা কি জান? হয়ত আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমরা যা ইচ্ছা কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।"

"তোমরা যা চাও কর," সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) উদ্ধৃতি বললেন, "যখন এমন মৃত্যু কারো উপর আপতিত হয়ে যায় তখন তার সমস্ত ইবাদত তার উপর আর ফরয থাকে না। তার পর নিজেই প্রশ্ন করেছেন, মানুষ কি তখন এমন হয়ে যায় যে, তার জন্য সব কিছুই জায়েয হয়ে যায়? তারপর তিনি নিজেই উত্তর দিয়েছেন, যে ইবাদত হতে অব্যাহতি পেয়ে যায় না বরং ইবাদত তার জন্য এরপর আর ভারী বা বোঝা মনে হয় না। তখন সে বড় কষ্ট করে চেষ্টা করে ইবাদত করে না বরং ইবাদত তার জন্য বড় সুমিষ্ট, সুস্বাদু খাদ্য দ্রব্যের মত হয়ে যায়। তার দ্বারা আল্লাহ্র নাফরমানী (অবাধ্য হওয়া) বা বিরোধিতা তার দ্বারা সম্ভব হয় না। আল্লাহ্র যিক্‌র তার জন্য আরামদায়ক, আনন্দদায়ক হয়ে যায়। এ সেই মাকাম (রূহানী মর্যাদা) যেখানে বলা হয়েছে, ই'মালু মাশি'তুম' 'তুমি যা খুশী কর। যা ইচ্ছা কর। এর অর্থ এই নয় যে, তার জন্য সব বিধি-নিষেধ তুলে নেয়া হয়। বরং সে তখন আর অবাধ্য হত পারে না, মন্দ কাজ করতে পারে না'। এর উপমাস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, কোন পুংশক্তিহীন ব্যক্তিকে যদি বলা হয় যে, 'যা যা খুশী কর", সে কি করতে পারে? অতএব যা ইচ্ছা করতে পার বলার অর্থ এই নয় যে, নাফরমানী করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। এমন অর্থ করা বড় নির্লজ্জতা ও বোকামী হবে। এটাতো বড় উঁচু দরের উচ্চতর মাকাম (মর্যাদা) যেখানে হাকীকাত তথা প্রকৃত সত্য তথ্য উদঘাটিত হয়। পবিত্রাত্মা ব্যক্তিরা বলেন, এ স্থানে ইলহাম বা ঐশী বাণী লাভ হয়। এমন ব্যক্তির মর্জি (ইচ্ছা) আল্লাহ্র মর্জি হয়ে যায়। এমন সময় এমন ব্যক্তিকে আদেশ দেয়া হয়ে থাকে- 'যাও যা ইচ্ছা কর।' অতএব এ সময় ইবাদত আর ভারী বোঝা হয় না বরং ইবাদত সুস্বাদু খাদ্য সুমিষ্ট খাদ্যের মত হয়। তাই তো বলা হয়েছে **হাযাল্‌লাযী রুযিক্বনা মিন কাবলু** (সূরাতুল বাকারা ঃ ২৬) এতো সেই রিয্‌ক যা ইতঃপূর্বেও আমরা পেয়েছি।"

[আল্ হাকাম; ৭ম খন্ড; নং ৩১ ঃ ২৪, আগষ্ট ১৯০৩ইং পৃঃ৪]

এর অর্থ এই যে, পরকালে যে রিয্‌ক তারা পাবেন সে রিয্‌ক তারা ইহকালে ইবাদতের সুস্বাদ আকারে কিছুটা অনুভব করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ২৮ এপ্রিল। ১৯০৪ইং তারিখে ইলহাম পেয়েছেন, "মালুমা শিতুম ইন্নি গাফারতুলাকুম ..." (বদর, ৩য় সংখ্যা নং ১৬, ১৭, ২৪ এপ্রিল, ১৯০৪ইং পৃঃ ৮)

(আল্ হাকামের বিশেষ সংখ্যা, ৮ম সংখ্যা ২৮ এপ্রিল, ১৯০৪)।

অনুবাদ ঃ কর যা ইচ্ছা; আমি তোমাকে পাপ থেকে মুক্তি দিয়েছি, হেফাযত করে দিয়েছি, ইনশাআল্লাহ্ (আল্লাহ্র ইচ্ছায়) তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। কর তোমার ইচ্ছা। আমি তোমার সম্পর্কে আমার ফিরিশ্‌তাদের আদেশ দিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ্ তোমার বয়স্কাল বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। আমার নেয়ামত (পুরস্কার)-কে স্মরণ কর। আমি তোমার জন্য নিজ হাতে আমার রহমত ও কুদরতের (শক্তি) গাছ লাগিয়ে দিয়েছি।"

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝

وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝

অনুবাদ ঃ তীন ও যয়তুনের (ডুমুর ও জলপাই) কসম এবং সিনাই পর্বতের এবং এই নিরাপদ শহরের (কসম) (সূরা তীন)। এ সূরা তো প্রায় নামাযে পাঠ করা হয়।

আল্লামা আবূ আব্দুল্লাহ্ কুরতুবী লিখেছেন, 'কারো কারো মতে ওয়াত্‌তীন অর্থ দামেস্ক শহর এবং যয়তুন অর্থ বায়তুল মুকাদ্দাস। অর্থাৎ আল্লাহ্তাআলা দামেস্ক শহরের পাহাড়ের কসম খেয়েছেন, কারণ সেটি হযরত ঈসা (আঃ)-এর আশ্রয়স্থল। বায়তুল মুকাদ্দাস এর কসম খেয়েছেন এজন্য যে, সেটি আম্বিয়ায়ে কেরামের অবতরণস্থল। মক্কা শহরের কসম খেয়েছেন আল্লাহ্ কারণ সেখানে হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) আগমন হয়েছিল এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জন্মভূমি (তফসীর কুরতবী)।

আল্লামা মাহমুদ বিন ওমর যমখশরী উপরোক্ত আয়াতের তফসীর করেছেন ঃ

হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) হিজরতের স্থান, হযরত ঈসা (সঃ)-এর জন্মস্থান ও প্রথম জীবনের আবাসভূমি, যেখানে তীন ও যয়তুন উৎপন্ন হয়েছে। তূর সেই স্থান যেখানে হযরত মূসা (আঃ)-কে আহ্বান করা হয়েছিল। মক্কা বায়তুল্লাহ্ শরীফ, সমগ্র পৃথিবীর হেদায়াত এবং আঁ হযরত (সঃ)-এর জন্মস্থান ও আবির্ভূত হবার স্থান' (তফসীরে কাশ্‌শাফ)। এখানে কসম খাওয়া হয়েছে। কসম অর্থ সাক্ষী। অর্থ এই যে, বায়তুল মুকাদ্দাস সাক্ষী এবং বাকী পবিত্র স্থানগুলোও সাক্ষী যে, এগুলো সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করতে থাকবে, কোন বিরোধি-শক্তি এর প্রসিদ্ধি রোধ করতে পারবে না।

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজী এ আয়াতগুলোর তফসীর করেছেন, লিখেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে এ কথাগুলো দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকার পাহাড়সমূহকে বুঝানো হয়েছে। সুরিয়ানি ভাষায়- তুরে তীনা ও তুরে যায়তাও বলা হয়েছে। এতদুভয় স্থান তীন ও যয়তুনের উৎপত্তি স্থান। অর্থ হবে আল্লাহ্ আম্বিয়া কেরামের আবির্ভাবের স্থানগুলোর কসম খেয়েছেন। তীন (ডুমুর) উৎপন্ন হওয়ার বিশেষ পাহাড় হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্য যয়তুন

উৎপন্ন হবার স্থান উত্তর দিকের পাহাড়গুলো বনী ইসরাঈলী নবীগণের আবির্ভাবের স্থান; এবং তুর অর্থ হযরত মূসা (আঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তিস্থান। বালাদে আমীন অর্থ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাবের স্থান। এ সবের কসমের অর্থ উক্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা (তফসীর কবীর, রাজি)।

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজী লিখেছেন,

বালাদে আমীন এর অর্থ যে, এখানে আমীন অর্থ 'আমেন,' অর্থাৎ আমন বা নিরাপত্তা প্রদানকারী। বালাদে আমীন অর্থ মক্কা শরীফ। কাশ্‌শাফ-এর লেখক লিখেছেন, 'যার উপর আমানত রক্ষার দায়িত্ব প্রদান করা হয় তাকে 'আমীন' বলা হয়। তার আমানতদারী বা আমানত রক্ষার অর্থ এই যে, তার মধ্যে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না হওয়া। এটাও হতে পারে যে, 'আমীন' যা ফায়েলের ওযনে আছে তার অর্থ 'আমন' বা নিরাপত্তা প্রদানকারী। অর্থাৎ নিরাপত্তাদানকারী শহর এবং নিরাপদ শহর উভয় অর্থই হতে পারে। তাছাড়া ইস্‌মে ফায়েল অর্থে নিরাপত্তা প্রদানকারী শহরও হতে পারে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে,' হারামান আমেনান" (তফসীর কবীর) অর্থাৎ কুরআন শরীফ নিজেই স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, এ শহরকে আমীন এবং আমেনান তথা নিরাপদ ও নিরাপত্তা প্রদানকারী শহর বলা হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন, "তীন যায়তুন হযরত ঈসা ও মূসা (আঃ)-এর উপর ঐশীবিকাশের স্থান এবং বালাদে আমীন আঁ হযরত (সঃ) এর স্থান।" (তাশ্‌হিযুল আযহান পত্রিকা, ৮ম সংখ্যা; নং ৯; পৃঃ ৪৮৮)।

"খোদা সিনাই পাহাড় থেকে বেরিয়েছেন, শাইর পাহাড়ে তাজাল্লী করেছেন, এবং ফারান পাহাড়ের চূড়ায় বিকশিত বা প্রকাশিত হয়েছেন। তার ডান হাতে শরীয়ত আছে এবং তিনি ফিরিশ্‌তাদের সৈন্য বাহিনীর সাথে এসেছেন" (তওরাত; দ্বিতীয় বিবরণ- ৩৩ঃ২)।

"আল্লাহ্ দক্ষিণ থেকে আসবেন; কুদ্দুস ফারান পাহাড় থেকে; আকাশ তার সৌন্দর্যের দ্বারা ভরে গেছে; পৃথিবী তার প্রশংসায় ভরে গেছে" (হাবক্কুক ৩ঃ৩)।

"সিনাই পাহাড় থেকে মূসার অনুরূপ এক বাদশাহ্ যিনি যাহেরি ও বাতেনি শারিয়তধারী তিনি রেরিয়েছেন। শাইর বায়তে লাহম ও নাসেরা থেকে মসীহ্ যাহির হয়েছেন।"

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে কুরআন শরীফে হযরত মুহাম্মদ-এর জন্য বর্ণনা করা হয়েছে। তীন, যায়তুন [ডুমুর, জলপাই]-এর কসম; এবং সিনাই পাহাড় ও শান্তির শহরের (মক্কার) কসম।"

ভবিষ্যদ্বাণীটি বালাদে আমীনে (শান্তির শহর) এসে সমাপ্ত হয়েছে। পূর্বেরগুলো নবীগণের ক্রমবিকাশের চিহ্নস্বরূপ। বালাদে আমীনে এসে শেষ হচ্ছে।

"উল্লিখিত তিনটি স্থানের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। "আহদে আতীক" এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের বিস্তারিত উল্লেখ আছে। ...কুরআনের বর্ণনা মতে তীন ও যায়তুন হযরত ঈসা মসীহ্‌র আবির্ভাব স্থলের প্রতীকস্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। ফারান উপত্যকা বা ফারান জঙ্গলের অর্থ মক্কা শহর। এ শহরের ভবিষ্যদ্বাণীও শুভসংবাদ দিয়েছেন হযরত ঈসা ও হযরত মূসা (আঃ)। মক্কা শহরে যে ঐতিহাসিক শরীয়ত নাযেল হয়েছে সে শরীয়ত সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অনুবাদ ঃ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে (ধর্ম) পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য আমার নেয়ামতকে (পুরস্কার) সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীনরূপে নির্ধারণ করে দিলাম।" [সূরাতুল মায়েদা-৫ঃ৪ আয়াতাংশ]

ফারান পাহাড়ের থেকে এমন মহাবিকাশ ঘটে গেল যে, সমগ্র পৃথিবী তাকে স্বীকার করেছে। [আঁ হযরত (সঃ)-এর আবির্ভাব] তাঁর ডান হাতে অতি উজ্জ্বল শরীয়ত রয়েছে। তাঁর সৈন্যবাহিনী ফিরিশ্‌তাদের বাহিনী। কার কারণে খোদাতাআলা দক্ষিণ দিক থেকে বিকশিত হয়েছেন। তাঁর প্রশংসায় পৃথিবী ভরে গেছে। স্বপক্ষিয় ও বিপক্ষীয়রা তাঁকে মুহাম্মদ ও 'আহমদ' নামে ডেকেছে। এর বেশি পৃথিবীতে তাঁর প্রশংসা আর কি হবে যে, শত্রুরাও তাঁকে 'মুহাম্মদ' বলে ডেকেছে" (হাকায়েকুল ফুরকান- ৪ খন্ড; পৃঃ ৪১০-৪৪১)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আর একটি ইলহাম ঃ "এবার তুমি শান্তি, নিরাপত্তা এবং বরকতসহ নিজ গ্রামে যাবে এবং আমি তোমাকে তারপরও এখানে নিয়ে আসব" (তাযকিরাহ্ পৃঃ ৮০৫)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

অর্থ ঃ "আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময় অযাচিত-অসীম দানকারী, বার বার কৃপাকারী। কুরায়েশদের মধ্যে পরস্পর অনুরাগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, (হ্যাঁ) তাদের মধ্যে অনুরাগ ও সম্পর্ক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, (আমরা) শীত ও গ্রীষ্মকালের সফর রেখেছি। সুতরাং তারা যেন এ গৃহের প্রভুর ইবাদত করে যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় অন্ন দান করেন, ভয়-ভীতি হতে নিরাপত্তা দেন" (সূরাতুল কুরায়েশ)।

এ সূরায় যে ভবিষ্যদ্বাণী আছে তা আমার পক্ষে বার বার পূর্ণতা লাভ করেছে। আমি আল্লাহ্‌র নেয়ামতের বর্ণনা আকারে আপনাদের সামনে বলছি। একবার যখন আমরা আমেরিকা সফরে গিয়েছিলাম তখন বড় ভীতি-প্রদ পরিস্থিতি ছিল। খাদ্য সম্পর্কেও ছিল, আবার মানুষের আক্রমণ থেকে রক্ষার বিষয়াদিও ছিল। সেখানে অনেক সন্ত্রাসী প্রায়ই সর্বত্র ঘোরাফেরা করে। আমার সাথে আমার স্ত্রী ও দুই মেয়ে ছিল। আমি তাদের ভয়ে এ সূরা পড়েছিলাম। এখানে বর্ণিত নিরাপত্তার কথা এমনভাবে পূর্ণতা হতে দেখলাম যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এমনভাবে পারবে না। সুর্ব প্রথম চমকপ্রদ ঘটনা এই যে, আমরা শিকাগো শহরে প্রবেশ করলাম। অনেক বড় শহর, একশ মাইল বিস্তৃত। আমরা প্রায় অর্ধেক শহর ঘুরে গেলাম। আমি প্রত্যেক মোড়ে বলছিলাম, এখানে মোড় নিব না। অর্ধেক শহর পার হয়ে এক মোড়ে এসে আমি মোড় নিলাম। কাউকে জিজ্ঞেস করলাম না। তারপর এক মোড়ে মোড় নিলাম। তারপর ডানে মোড় নিলাম। তারপর আবার ডানে, তারপর বামে মোড় নিলাম। কতক্ষণ ঘুরে ঘুরে অবশেষে এক পেট্রোল পাম্পে গিয়ে মটর কার দাঁড় করালাম। পেট্রোল পাম্পে চারিদিকে গুন্ডারা ঘোরাফেরা করছিল। কিন্তু গাড়ী দাঁড় করাতেই দেখলাম, এক মহিলা দৌড়ে দৌড়ে আমার কাছে এসে বলল, আমি আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি? সে মহিলাও নেশাগ্রস্থ ছিল, বুঝলাম। আমি তাকে আমার এক বন্ধুর টেলিফোন নাম্বার দিয়ে এ নাম্বারে ফোন করে আমার বন্ধুকে ডাকতে বললাম। সে ফোন করে এসে আমাকে বলল, 'আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন, সে এখনই এসে যাবে, খুবই কাছে। আমাদের কথা শেষ

হতে না হতেই আমার বন্ধু তার গাড়ী নিয়ে সেখানে পৌছে গেলেন। আমার আশপাশে খারাপ ইচ্ছায় যে গুন্ডারা জমা হচ্ছিল তারা কেটে পড়ল। আমার ঐ বন্ধু আমাকে নিরাপদে তাঁর বাসায় নিয়ে পৌছে গেলেন। তাঁর বাসাটা আমাদের মসজিদের কাছেই ছিল। আল্লাহ্‌র ফযলে সেখানে আমাদের থাকা খাওয়ার খুব ভাল ব্যবস্থা ছিল।

এমন ঘটনা এখানেই শেষ না। বরাবরই এ রকম ঘটনা বার বার ঘটেছে আমেরিকায়। তারপর ফেরত এসে হল্যান্ডেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। হল্যান্ডে আমার জানা ছিল না, আমাদের মসজিদ কোথায়। তখন প্রায় অর্ধ-রাত্রি যখন আমরা ইংল্যান্ডের হেগ শহরে প্রবেশ করেছি। কেউ আমাদের জিজ্ঞেসও করে নি যে, কে তোমরা, কোথায় যাবে? ভাষাও আমরা বুঝি না। হঠাৎ আমরা দেখলাম, ছ'জন যুবক আনন্দে আত্মহারা সাইকেলে করে কোথাও যাচ্ছে। আমি তাদেরকে আমাদের মসজিদের ঠিকানা লেখা দেখলাম। তাদের একজন বলে উঠল, এতো আমাদের বাড়ীর পাশেই! তারপর তারা সাইকেলে সামনে সামনে যেতে থাকল আমরা পেছনে পেছনে মোটর কার চালিয়ে গেলাম। সেকালে হাফেয কুদরতুল্লাহ মরহুম মসজিদের ইমাম ছিলেন। আমরা সোজা গিয়ে তাঁর দরজার কড়া নাড়লাম। বাস! আমরা শান্তির নীড়ে পৌছে গেলাম। ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ আবার খাবারও পেয়ে গেল।

অনেক কথা ছিল। সব কথা এখন বলব না। শেষ ঘটনাটি বড়ই মজাদার। শুনে নিন। আমরা নরওয়ে যখন গেলাম, ধারণা ছিল যে, মকসুদ সাহেবের বাড়ীতে থাকব। তারা বলে রেখেছিলেন, নিমন্ত্রণ দিয়ে রেখেছিলেন। আমরা ভাষাও জানতাম না, তাদের বাসাও চেনা ছিল না। সড়কগুলোও কেমন কেমন ছিল। আমার কাছে তাদের বাসার ঠিকানা লেখা ছিল। প্রথম ব্যক্তি যাকে আমি গাড়ী থামিয়ে ঠিকানা দেখালাম, সে এসে আমার পাশে আমার সাথে বসে গেল। সামান্য ইংরেজী জানত। বলল, এ বাড়ী তো তাদের বাড়ীর কাছেই। আমাদের সাথে বসে সে আমাকে মকসুদ সাহেবের বাড়ী নিয়ে গেলেন।

এসবগুলোকে আপনারা আকস্মিক বলুন বা যা-ই বলুন আমার সাথে সব সময় এমনই ঘটেছে। "আত্বআমাহুম মিন জুঈওয়া আমানাহুম মিন খওফ"। অতএব এ সূরা কুরায়েশ যখনই আমি পড়ি এ সমস্ত ঘটনা আমার মনে পড়ে যায়। আল্লাহ্ তিনি, যিনি নিজ অস্তিত্বের প্রমাণ বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে নিজেই দিয়ে থাকেন। নতুবা কোথাও তো খোদাকে দেখা যায় না। কিন্তু তার অস্তিত্বের পরশ সর্বত্র পাওয়া যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন ঃ

কুদ্‌রাত্ সে আপনি জাত কা দেতা হ্যায় হক্ ছবুত!

উস্ বেনিশাঁ কি চেহ্‌রানুমায়ী এহি তো হ্যা!!

আল্লাহ্ যিনি সবচেয়ে সত্য (হক) তিনি নিজেই শক্তি বিকাশের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে থাকেন।

ঐ অদৃশ্য ও চিহ্নহীন (আল্লাহ্‌র) চেহারা প্রদর্শন এভাবেই তো হয়।

হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে ইয়াযীদ বর্ণনা করছেন, আঁ হযরত (সঃ) সূরা কুরায়েশ সম্পর্কে বলেছেন, 'হে কুরায়েশ'! তোমরা ধ্বংসের দিকে যেও না, তোমরা এ গৃহের (কা'বা শরীফ) প্রভু বা মালিকের ইবাদত কর যিনি তোমাদিগকে সবসময় ক্ষুধার সময় অন্ন যুগিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি পূর্ণ অবস্থায় রক্ষা করেছেন, নিরাপত্তা দিয়েছেন (মুসনাদ আহমদ, মুসনাদ আল্ কাবায়েল)

মুজাহিদ (রহঃ) 'লেঈলাফে কুরায়েশীন' অর্থ এই যে, কুরায়েশদের অন্তরে সফর করার আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্! ফলে তারা শীত হোক বা গ্রীষ্ম হোক সফর করতে কষ্ট বোধ করত না। তারপর 'আমানাহুম'-এর অর্থ করেছেন, কা'বা শরীফ তাদেরকে সকল প্রকার শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা করে দিয়েছিল' (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)।

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজি **রেহ্‌লাতাশ্ শেতায়ে ওয়াস সায়ফ'**, এর তফসীর করেছেন,

কুরায়েশরা দু'টি সফর করত। একটি শীতকালে ইয়েমেন এর উদ্দেশ্যে কারণ ইয়েমেন তুলনামূলকভাবে কিছু গরম অঞ্চল ছিল। আর একটি সফর করত গ্রীষ্মকালে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে, কারণ সিরিয়া শীত প্রধান দেশ (তুলনামূলকভাবে) ছিল।

হযরত আতা হযরত ইবনে আব্বাসের মতামত বর্ণনা করেছেন যে, কীভাবে এদের সফর আরম্ভ হয়েছিল। বহু অতীতকালে এমন হোত যে, কোন বংশ যদি দারিদ্রতার কবলে পড়ত খাদ্যাভাব দেখা দেখা দিত, তারা গোপনে নিজেদের পরিবার-পরিজন নিয়ে মক্কার বাইরে কোথাও গিয়ে গোপন থাকত এবং সেখানে মারা যেত। কুরায়েশদের মধ্যেও এ প্রথা চালু ছিল। তারপর এক সময় হাশেম বিন আব্‌দে মান্নাফ গোত্রের সরদার হলেন। একদিন তিনি তার গোত্রের লোকদের একত্র করে বললেন,

হে কুরায়েশ! তোমরা দরিদ্রতার কবলে পতিত হয়েছে! সংখ্যায় কমে যাচ্ছ। অপদস্থ হচ্ছ। অথচ তোমরা হরম শরীফের (কা'বাগৃহ) মুতাওয়াল্লী (রক্ষণাবেক্ষণকারী)। সমস্ত আদম সন্তানদের মধ্যে তোমরা বেশি সম্মানিত বাকীরা তোমাদের অনুসারী। কুরায়েশরা বলল, আপনি আমাদের সরদার। আমরা আপনার পেছনে আছি। আপনি যা সিদ্ধান্ত নিবেন, যা আদেশ করবেন আমরা তা পালন করব। আমরা আপনার সিদ্ধান্তের বিপরীত কিছু করব না। একথা শুনে হাশেম বিন আব্দে মান্নাফ কুরায়েশের সকলকে দু'টি বাণিজ্যিক সফরের জন্য প্রস্তুত করলেন। শীতকালে ইয়েমেনের দিকে, গ্রীষ্মকালে সিরিয়ার দিকে। বাণিজ্যিক এ সফরের ফলে কুরায়েশদের আর্থিক সংকট দূর হয়ে গেল। যে ধনী ব্যক্তি বেশি লাভ করত সে তার অতিরিক্ত ধন গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দিত। ফলে তাদের মধ্যে কেউ আর গরীব থাকল না। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পরও এ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। আরবদের মধ্যে কুরায়েশদের মত ধনবান ও মর্যাদাবান আর কেউ ছিল না।

আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী আরো লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা এসব সফরের জন্য শর্ত রেখেছেন যে, তারা পরস্পর একে অপরের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে। এজন্য অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, **ওয়ালা জেদালা ফিল হাজ্জের** মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ করা যাবে না। একথা সবাই বুঝে যে, সফরের তুলনায় সমাজে বসবাসরত অবস্থায় উত্তম আচরণের বেশি প্রয়োজন। এখানে এ বাক্যটির আরো একটি অর্থ আছে। বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষের মক্কা যাবার বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে। বহিরাগত বিপুল সংখ্যায় মানুষের মক্কায় যাবার ফলে মক্কাবাসীদের অনেক অর্থনৈতিক লাভ হয়। **আসহাবিল ফিল** (আবরাহার বাহিনী) যদি সফল হয়ে যেত সেদিন তবে মক্কাবাসীরা এত বড় লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে যেত চিরতরে। (তফসীরে কাবীর, রাজী)

এখানে মক্কাবাসীদের দক্ষিণ ও উত্তরের দিকের সফরের কথাও এখানে আছে। এবং দক্ষিণ ও উত্তরের মানুষের মক্কার দিকে সফরের কথা অন্তর্নিহিত আছে।

আল্লামা আব্দুল্লাহ্ কুরতুবী আলোচ্য সূরার আয়াত **ওয়া আমানাহুম মিন খওফ**-এর তফসীর করে লিখেছেন, "ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার জবাব এখানে আল্লাহ্ দিয়েছেন। হযরত

ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া ছিল ঃ (সূরাতুল বাকারা ঃ ১২৭) (তফসীর কুরতুবী)

এটি খুবই উত্তম কথা সত্য কথা যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করেছিলেন যে, ' এ শহর মক্কাকে নিরাপদ শহর বানাও এবং এদের রিয্ক প্রদান কর।" হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ারই প্রতিফলন এ সূরা কুরায়েশে হয়েছে।

আল্লামা রাজী আরো লিখেছেন, 'কুরায়েশদের বাণিজ্যিক কাফেলা বড় নিরাপদে সফর করত। কেউ তাদের বাধা দিত না, লুট-পাট করত না। সফর ছাড়াও কোন সময় মক্কার উপর কেউ আক্রমণ করে নি কখনও। অথচ কুরায়েশরা (মক্কাবাসীরা) ছাড়া আরবের অন্যান্য গোত্রগুলো কখনও শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ ছিল না। একথা বলা হয়েছে,

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٨﴾

অর্থ ঃ "তারা দেখে না যে, আমরা এ শহরকে শান্তিপূর্ণ নিরাপদ বানিয়েছি।" (সূরা আন কবূত-২৯ঃ৬৮-আয়াতাংশ)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) লিখেছেন, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে কুরায়েশরা প্রতি বছর দু'টি সফর করত। শীতকালে তারা আফ্রিকা, হিন্দুস্তান ও ইয়েমেন দেশসমূহে যেত।" হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ) বললেন, তারা আফ্রিকা, হিন্দুস্থানের দিকে আসত। "গ্রীষ্মকালে তারা সিরিয়া ও ইরানের দিকে যেত। সকল দিকের মানুষ তাদেরকে বড় সম্মান প্রদর্শন করত। উপঢৌকন ইত্যাদিও পেশ করত। আল্লাহ্ না করুন, যদি আসহাবিল ফীল জয়লাভ করত তবে মক্কার সম্মান বাকী থাকত না। কিন্তু আল্লাহ্ আসহাবিল ফীলকে ধ্বংস করে মক্কার সম্মানকে আরো বেশি বাড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ কুরায়েশকে আরো বেশি সম্মান প্রদর্শন করতে আরম্ভ করেছিল এবং তাদের সফরগুলো আরো সহজ মঙ্গলজনক হয়েছিল" (বদর পত্রিকা, কাদিয়ান; ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯১২)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) আরো বলেছেন, কাবাকে 'বায়তুল্লাহ্'ও বলা হয় এবং বায়তুল আতীকও বলা হয়। কুরআন মজীদ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ অঞ্চল, সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা ও সবুজে পূর্ণ হয়ে যাবে, নহর-নদী-নালা হবে, গাছপালা হবে। আজকের যুগে এ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা লাভ করা যে সম্ভব, তা সুস্পষ্ট। আল্লাহ্র দিকে ঝুঁকে গিয়ে ইবাদতে রত হয়ে, তাওয়াক্কুল, (আল্লাহ্-ভরসা)-কে কার্যকর করে জাগতিক দরিদ্রতা থেকে রক্ষা পাওয়ার উদাহরণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে তো অনেক আছে। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে সমষ্টিগতভাবে আরব দেশের এই অঞ্চলটি একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। এ অঞ্চলটি আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য যখন নির্ধারিত হোল তখন দেখা গেল যে, একেবারে অনুর্বর মরুভূমি হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর সমস্ত নেয়ামত জাগতিক জীবনের সকল নেয়ামত তারা লাভ করেছে। হাদীস থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে, আল্লাহ্ তার নফসের মধ্যে ইহকালের প্রতি আকর্ষণ রাখেন না এবং ইহজীবনের দুঃখে-কষ্টে আল্লাহ্ তার সহায় হন। কিন্তু যে ব্যক্তি পরকালের কথা স্মরণ না করে ইহ জগতের প্রতি ঝুঁকে যায় আল্লাহ্ তাকে এমন করেন যে, সে নিজের সামনে কেবল অভাবই অভাব দেখে এবং আল্লাহ্কে অভিভাবক হিসাবে পায় না।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কা'বা গৃহের জন্য যে দোয়া করেছিলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٧﴾

অনুবাদ ঃ "হে আমার প্রভু! এ শহর (মক্কা)-কে নিরাপদ শহর করিও ..." (সূরাতুল বাকারা ঃ ১২৭ আয়াতাংশ)

আল্লাহ্তাআলা এ দোয়াও কবুল করেছেন। ফলে আল্লাহ্র অস্তিত্ব এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের সত্যতার পক্ষে একটি উজ্জ্বল প্রমাণ ও দলিল সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ্তাআলা কা'বাগৃহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন,

"তারা কি চিন্তা করে দেখে নি যে, আমরা (মক্কার) পবিত্র কা'বা গৃহকে নিরাপদ স্থান করেছি। অথচ লোকদেরকে তাদের চতুষ্পার্শ হতে অতর্কিতে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়? তারা কি মিথ্যার উপরে ঈমান আনছে এবং আল্লাহ্র নেয়ামতকে অস্বীকার করছে"?

এ ভবিষ্যদ্বাণী আজ পর্যন্ত পূর্ণতা পেয়ে আসছে। একজন মুফাসের লিখেছেন যে, আরবদেরকে মুর্খ বলা হোত। ইসলাম গ্রহণের ফলে তারা জ্ঞানী বলে আখ্যায়িত হয়েছে।... এখন তো ইসলামের কারণে অনেক মর্যাদাবান হয়েছে, জ্ঞানের দিক থেকে এবং সবদিক থেকে। ধন-সম্পদের দিক থেকে দেখ তাদের অবস্থা! মানুষ দেখ কীভাবে সৌদী আরবের ভিসা পাবার জন্য দৌড়াচ্ছে। যেমন সৌদী আরবের ভিসা পাওয়া মানেই ধনবান হয়ে যাওয়া। যারাই দরিদ্র অবস্থায় সৌদী আরব গেছে, সে তো ধনী হয়ে গেছে। তার পরিবার-পরিজনও ধনী হয়েছে। এ তো আল্লাহ্র অনুগ্রহ যে, আজ পর্যন্ত তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা পাচ্ছে। কাফির ছিল তারা, আল্লাহ্ তাদের মুসলমান করে দিলেন। মূর্খতার যুগে দরিদ্র ছিল। আল্লাহ্ তাদের খাদ্যও দিয়ে দিলেন পবিত্র ওহীও নাযেল করলেন প্রচুর" (পরিশিষ্ট বদর, কাদিয়ান, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯১২ইং)।

বদর পত্রিকা (কাদিয়ান) এর সম্পাদক লিখেছেন, "আরব সাহেব এদিক-ওদিক দেখে জনশূন্যতা দেখে বললেন, 'এ তো কেবল হযরত আকদস (আঃ)-এর পবিত্র উপস্থিতির বরকতে এখানে এত বিপুল পরিমাণ লোক আসেন, নতুবা এমন এক অজ পাড়াগাঁয়ে (যার আশে পাশে কোন শহর নেই)-কে আসত!" হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরব সাহেবের কথা শুনে বললেন,

এ স্থানের উদাহরণ মক্কা শরীফের মত। সেখানকার অবস্থাও এমন ছিল যে, আরবরা সেখানে বসবাস করত কিন্তু সেখানে কিছুই ছিল না। মক্কায় আরবরা বাইরে ব্যবসায়-বাণিজ্য করে খাদ্য সংস্থান করত। তাদের অবস্থার কথা সূরা কুরায়েশে বলা হয়েছে" (বদর, ২য় খন্ড, নং ৪; ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯০৩, পৃঃ ২৬)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি ইলহামে উল্লেখ আছে ঃ ইন্নাকাল ইয়াওমা লাদায়না মাকীনুন আমীন..."

অর্থাৎ "আজ তুমি আমার নিকট বড় মর্যাদাবান এবং নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থান তোমার। দীন ও দুনিয়া উভয় দিক থেকে তোমার উপর আমার রহমত আছে। তুমি সমর্থনপ্রাপ্ত। খোদা তোমার প্রশংসা করছেন এবং তোমার দিকে আসছেন। তুমি জেনে রাখ খোদার সাহায্য খুবই নিকটে" (তাযকেরাহ্, পৃঃ ৭৮)।

১৮৯৩ইং সনের একটি এলহাম- কুল ইন্নি উমিরতো ওয়া আনা আওয়ালুল মু'মিনীন..." অর্থ ঃ তুমি বল, আমি খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট (মা'মুর) এবং আমি সর্বপ্রথম ঈমান এনেছি। হে ঈসা! আমি তোমাকে মৃত্যু দিব এবং নিজের দিকে তুলে নিব এবং বিরোধীদের সকল প্রকার অন্যায় অভিযোগ দূর করে তোমাকে পবিত্র প্রমাণ করব। এবং কিয়ামত পর্যন্ত তোমার অনুসারীদেরকে তোমার অস্বীকারকারীদের উপর বিজয় দিয়ে রাখব।" এটি একটি চলমান ও প্রবহমান ব্যবস্থাপনা যা শেষ হবে না। প্রত্যেক ক্ষেত্রে আল্লাহ্র ফযলে

আহমদীরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অস্বীকারকারীদের উপর বিজয় লাভ করে চলেছেন। পাকিস্তানে অত্যন্ত বিরোধিতার মধ্যেও আহমদীরা প্রতিনিয়ত নতুন আহমদীদের পাচ্ছেন (নতুন মানুষ আহমদী হচ্ছে)।

(ইলহামের পরবর্তী অংশের অনুবাদ)

"তোমার অনুসারীদেরকে তোমার অস্বীকার-কারীদের উপর বিজয় দান করব এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা বিজয়ী হয়েই থাকবে। এ বিজয় শেষ বা সমাপ্ত হবার মত নয়। নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত এ বিজয় লাভ হতে থাকবে।" আজ তুমি আমার কাছে বিরাপদ অবস্থানে আছ। তুমি আমার কাছে এমনই যেমন আমার তৌহীদ (একত্ববাদ) এবং আমার অতুলনীয়তা। অতএব এখন সময় এসে গেছে যখন তোমাকে সমর্থন দেয়া হবে এবং মানবমন্ডলীর মধ্যে তোমাকে পরিচিত ও প্রসিদ্ধি দান করা হবে"(তাযকিরাহ্,২২০ পৃঃ)।

তারপর ইলহাম ১৮৯৩ইং - অনুবাদ ঃ "এমন লোকেরা তোমার সাহায্য করবে যাদের অন্তরে আমরা নিজ থেকে ওহী করব। আকাশ থেকে।" এই ওহীর পূর্ণতা লাভ সবসময় হয়েছে, হচ্ছে। আজকাল আফ্রিকা ও বিভিন্ন দেশে বহু মানুষ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শুভ সংবাদের ভিত্তিতে আহমদীয়ত গ্রহণ করছে। কেবল আমাদের প্রচার পত্র, বই-পত্র পড়ে নয় বরং জামাতের সমর্থনে তাজা ঐশী নিদর্শন দেখে মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছে।

"এমন মানুষ তোমার সাহায্য করবে আমরা আকাশ থেকে যাদের উপর ওহী করছি। আল্লাহ্র বাণী অটল ও অপরিবর্তনীয়। তুমি আমাদের নিকট সম্মানিত এবং নিরাপদে আছ। তারা বলবে, এসব ওহী নয় বরং এমন কথা নিজ থেকে বানানো হয়েছে। তাদেরকে তুমি বলে দাও, তিনিই খোদা, যিনি এ সমস্ত বাণী ওহীর আকারে নাযেল করেছেন। তারপর তাদেরকে তাদের কল্পনার জগতে খেলাধূলা করতে ছেড়ে দাও" (তাযকিরাহ্ ঃ পৃঃ ২৩৯)।

তারপর ইলহাম ১৯০০ইং অনুবাদ ঃ "আমি তোমার অনুসারীদেরকে তোমাদের অস্বীকারকারীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী করে রাখব।" এটি একদিনের বিষয় নয় বরং চলতে থাকবে। "তুমি নিশ্চয় আমার কাছে মর্যাদাবান এবং নিরাপদ অবস্থানে আছ। তুমি আমার নিকট এতবড় মর্যাদার অধিকারী যে, মানুষ তা জানে না। আল্লাহ্ এমন করবেন না যে, তোমাকে পরিত্যাগ করবেন বরং তিনি পবিত্র ও অপবিত্রের (নাপাক) মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেখাবেন" (তাযকিরাহ্, পৃঃ ৩৬৬)।

২৯ এপ্রিল, ১৯০৩ইং এর একটি ইলহাম ঃ

"আমেনাম্ মিনাল্লাহির রহীম, আহমদ মকবুল" (হযরত আকদস (আঃ)-এর ইলহাম সংরক্ষিত ডাইরী থেকে)

অনুবাদ ঃ রহীম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমার নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে। আহমদ মকবুল।

১৯ এপ্রিল, ১৯০৪ইং তারিখের একটি ইলহাম ঃ (স্বপ্নের) রূইয়ার পর ইলহাম হয়েছে ঃ "মান দাখালাহু কানা আমেনান" অর্থ ঃ "যে এর মধ্যে প্রবেশ করবে সে বিপদসমূহ থেকে নিরাপদে এসে যাবে।" হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ইলহাম শোনাবার পরে বললেন, দেখ, এই মসজিদের কপালেও এই ইলহাম লেখা আছে যা প্রায় পঁচিশ বছর পূর্বের ইলহাম। যখন মানুষ কাদিয়ানকে জানতও না। তারপর আর একটি ইলহাম এই তারিখের ইলহাম ঃ "বলেছেন, আমি আমার জামাতের জন্য এবং কাদিয়ানের জন্য দোয়া করছিলাম যখন ইলহাম হোল ঃ "ফাসাহ্হিক্হুম তাসহিকা" অর্থ ঃ তাদেরকে নিষ্পেশিত কর খুব নিষ্পেশিত কর।

হযরত আকদস (আঃ) বলেছেন, "আমার ধারণা হল, আমার দিকে লক্ষ্য করে কেন বলা হল, 'নিষ্পেশিত কর', সাথে সাথে আমার চোখ পড়ল একটি দোয়ার উপর যা বায়তুদ্ দোয়ার দেয়ালে লেখা হয়েছিল এক বছর পূর্বে। সে দোয়া ছিল ঃ

"ইয়া রব্বি, ফাস্মায় দুয়ায়ী, ওয়া মায্যিক আদায়াকা ওয়া আ'দায়ী, ওয়ান্জিয্ ওয়া'দাকা ওয়ান্সুর আবদাকা ওয়া আরিনা আইয়ামাকা ওয়া শাহ্হের লানা হুসামাকা, ওয়ালা তাযার মিনাল কাযেরীনা শারীরা" -এ লেখা দোয়া দেখে আর ইলহামকে মিলিয়ে বুঝলাম এটি আমার দোয়া কবুলের সময়।"

"অনাদি কাল থেকে আল্লাহ্র সুন্নত (বিধান) এই যে, তাঁর মা'মুর (প্রেরিত)-দের পথে যারা বাধা হয়ে দাঁড়ায় তিনি তাদের সরিয়ে দেন। এ দিন আল্লাহ্র ফযলের দিন। এসব কিছু দেখে আল্লাহ্র উপর ঈমান দৃঢ় হয় যে, কীভাবে আল্লাহ্র পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়" (আল্ হাকাম, ৮ম খন্ড; নং ১৩; ২৪শে এপ্রিল, ১৯০৪ইং)।

১৪ই নভেম্বর, ১৯০৫ইং তারিখের রূইয়া ঃ "একটি কাগজ দেখানো হয়েছে যার উপর আরবী ভাষায় ঈমানের প্রকার ভেদ লেখা আছে। কী লেখা আছে তা স্মরণ নেই। কিন্তু খুব সম্ভব যা লেখা ছিল তার ভাবার্থ এই যে, ঈমান চার প্রকার।

১ম, বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখে বিশ্বাস করা। ২য়, সঠিক অর্থ বুঝে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখে বিশ্বাস করা। ৩য়, ঈমান অনুসারে আমল। ৪র্থ, ঈমানের মধ্যে ডুবে গিয়ে সম্পূর্ণ পরিবর্তন লাভ করা।" (বদর, কাদিয়ান; পৃ ১; ১৭ নভেম্বর, ১৯০৫)।

অবশেষে ১৯০৫ইং সনের আর একটি ইলহাম ঃ "আল্লাহ্তাআলা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি যেন জামাতকে জানিয়ে দেই যে, যারা ঈমান এনেছেন এমন ঈমান যার মধ্যে ইহজগতের কোন মিশ্রণ নেই, এবং এমন ঈমান যার মধ্যে ভয় বা মুনাফেকীর মিশ্রণ নেই, এমন ঈমান যার মধ্যে আনুগত্যের কোন প্রকার অভাব নেই- এমন মানুষেরা আল্লাহ্র পসন্দের মানুষ। আল্লাহ্ বলছেন যে, এরা তারা, যাদের কদম (পদক্ষেপ)'ক্বাদামা সিদক' এ আছে। (সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত)। আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে এসব ইলহামের পূর্ণতা দান করুন। [আল ফযল (লন্ডন) ইন্টারন্যাশনাল ২২ মার্চ, ২০০২ইং হতে অনুবাদ]

অনুবাদ-মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিক্হুম তাস্হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর (আইঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(০৮-০১-০২ তারিখে এমটিএ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত)

প্রশ্ন নং ১ ঃ হুযূর জুমুআর দিন খুতবা দেয়ার পর ইমাম সাহেব একবার বসেন তারপর দাঁড়িয়ে "খুতবা সানীয়া" (দ্বিতীয় খুতবা) দিয়ে থাকেন। কিন্তু যদি কোনো ইমাম এতটাই বৃদ্ধ কিম্বা দুর্বল হন যে, তাঁর পক্ষে খুৎবার পর কিছুক্ষণের জন্যে বসা এবং তারপর উঠে দাঁড়ানো সম্ভবপর না হয় তো সেই ইমাম সাহেব কি না বসে দাঁড়িয়ে "খুতবা সানীয়া" দিতে পারেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ না বসলেও চলবে। দাঁড়িয়েই তিনি খুতবা সানীয়া দিতে পারেন।

প্রশ্ন নং ২ ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনের অনেক ঘটনার ঠিক একশ' বৎসর পর আমরা পুনরাবৃত্তি হ'তে দেখেছি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ২০০২ সনে আমরা কি কি বিশেষ ঘটনার প্রত্যাশা করতে পারি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ একশ' বছর পর পর হযরত মসীহ্ মাওউদের জীবনের কিছু ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে আমরা দেখে আসছি। সুতরাং ১৯০২ সনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যেসব ইলহাম অবতীর্ণ হয়েছিলো ২০০২ সনে আমরা সেগুলোর পূর্ণতা আবার দেখতে পাবো, ইনশাআল্লাহ্।

প্রশ্ন নং ৩ ঃ দক্ষিণ আমেরিকায় আহমদীয়তের অবস্থা কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ দক্ষিণ আমেরিকাতে তুলনামূলকভাবে আহমদীয়তের অবস্থা দুর্বল। দক্ষিণ আমেরিকাতে ইহুদীদের প্রভাব খুব বেশী। তারা শুধু আহমদীয়া জামাতের তবলীগের রাস্তায়ই বাধা সৃষ্টি করে না অন্য মুসলমান সম্প্রদায়সমূহকেও সেই অঞ্চলে ধর্ম প্রচার করতে দেয় না। এক ধরনের মাফীয়া (MAFIA) চক্র অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছে সেখানে। তবুও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে অল্প সংখ্যায় আহমদীরা আছেন।

প্রশ্ন নং ৪ ঃ পাশ্চাত্য সমাজে ইসলাম প্রচারে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এ প্রশ্নটির সাধারণভাবে উত্তর দেয়া যায় না। এটি ব্যক্তি-বিশেষের ওপরে নির্ভর করে। কোন একটি পদ্ধতি দ্বারা সব পশ্চিমাদেশে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হবে না। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির মনে প্রবেশ করার বিশেষ ধরনের দরজা-জানালা থাকে। কোন ব্যক্তি যদি নাস্তিক হয়ে থাকে তাহলে তাকে আগে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করাতে চেষ্টা করতে হবে। তেমনিভাবে কেউ যদি কঠোর খৃষ্টান হয়ে থাকে তাহলে তার সম্বন্ধে জেনে তার সামনে আহমদীয়তের শিক্ষা তুলে ধরতে হবে। কেউ ইহুদী হয়ে থাকলে তার জন্যে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। আগে বুঝতে হবে আপনি যাকে তবলীগ করতে চান তার মনে কীভাবে প্রবেশ করা সম্ভব, সে অনুসারে তার সাথে মতামত বিনিময় করুন। সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আমাদের নিজের আচরণ ও ব্যবহার অত্যন্ত ভাল হতে হবে যাতে অন্য লোক আমাদের দিকে আকর্ষণ অনুভব করবে। যখন এক অ-আহমদী আমাদের সঙ্গে মিশ্‌তে চাইবে তখন তাকে ইসলাম এবং আহমদীয়তের আসল শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন নং ৫ ঃ একটি মেয়ে বলে ঃ "হুযূর জন্মদিনের পার্টিতে বা বার্থডে পার্টিতে যেতে পারি কি যেখানে গান-বাজনাও থাকে"?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি সব জায়গায়ই টিভি থাকে। আমরা যদিও ঐ ধরনের পরিবেশ পসন্দ করি না, কিন্তু সব বার্থডে পার্টিকে Boycott-ও করা ঠিক মনে করি না। এ ধরনের পার্টিতে যাওয়া যায়, কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

প্রশ্ন নং ৬ ঃ এক মহিলা বলেন, "পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে আছে যে, পাপ কার্যকে সুন্দর করে দেখানো হয়েছে। ঐ আয়াতের অর্থ কী"?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ মানুষের কাছে ভাল না লাগলে তো মানুষ পাপ করবে না। সুতরাং প্রত্যেক পাপী যখন পাপ কার্য করে থাকে তখন সে মনে করে যে, এটা ভাল। তা ঠিক কি ভুল তা কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্‌তাআলা বিচার করবেন। সে যখন পাপ করে তখন ভাল বলেই মনে হয়। যখন পাপ কাজ এক ব্যক্তির নিজের জীবনের উপর পড়ে তখন সে বুঝতে পারে সে কত বড় ভুল করেছে বা প্রতারণার শিকার হয়ে পড়েছে। কুরআনেও এ কথা বলা হয়েছে যে, আমরা পাপকে সুন্দর করে দেখিয়েছি কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন তারা বিচারের জন্যে উপস্থিত হবে তখন আল্লাহ্‌তাআলা ফয়সলা করবেন তারা ভাল করেছিলো না মন্দ।

প্রশ্ন নং ৭ ঃ মহানবী (সঃ)-এর নামের সাথে 'মুস্তফা' বলা হয়। এই 'মুস্তাফা' শব্দের উৎস কি এবং এর তাৎপর্য কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ 'মুস্তাফা' শব্দের অর্থ - যাকে আল্লাহ্ বেছে নিয়েছেন। আঁ হযরত (সঃ) আল্লাহ্ কর্তৃক পবিত্রকৃত ও বাছাইকৃত তাই তাঁকে আমরা 'মুস্তাফা' নামে সম্বোধন করে থাকি।

প্রশ্ন নং ৮ ঃ মিউজিকের প্রতি মানুষের মনে আকর্ষণ কি নাফ্‌সে আম্মারা হতে উৎপন্ন হয়ে থাকে? নাকি এ আকর্ষণ মানুষের প্রাকৃতিক এবং সভাবসুলভ অংশ?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ মিউজিক ও গান দুটো আলাদা জিনিস। আজকাল আমরা বিভিন্ন প্রকার মিউজিক দেখতে পাই যেমন পপ সঙ্গীত। এ গান মানুষকে উন্মত্ত করে তুলে। কিন্তু পূর্বকালে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত ছিলো যা মানুষের আত্মাকে প্রশান্ত করতো। সেই মিউজিক সম্ভবতঃ খারাপ নয়। আমরা জানি মহানবী (সঃ) মিউজিক পসন্দ করতেন না, কিন্তু সুললিত কণ্ঠে গান পসন্দ করতেন। এজন্য আমরা এমটিএ-তে মিউজিক প্রচার করি না কিন্তু সুললিত কণ্ঠে গান প্রচার করে থাকি। এতে কোন বাদ্যযন্ত্র থাকে না। এটাকে অন্যরাও পসন্দ করেন।

প্রশ্ন নং ৯ ঃ ফরয নামায আদায় করে লোকেরা সুন্নত পড়তে গিয়ে নামাযের জায়গা পরিবর্তন করে নেয় কেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এর কোন ব্যাখ্যা দেয়া যায় না। এটা অভ্যাসবশতঃ করে থাকেন। এ মুহূর্তে আমার কোন হাদীসের কথা মনে আসছে না যেখানে মহানবী (সঃ) এটা করার জন্য সুনির্দিষ্ট তাকিদ করেছেন।

প্রশ্ন নং ১০ ঃ আমরা স্বপ্ন দেখি কেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ স্বপ্ন এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে ঘুমের মধ্যে মানুষের চেতনা

হারিয়ে যেতে যেতে এমন এক পর্যায়ে পৌছে যায় যে, মৃত্যুর কাছাকাছি যায়। সেখান থেকে মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে তখন সে অবস্থা থেকে ফিরে আসে। বিজ্ঞানীরা বলেন, তা মনে থাকে না। বিজ্ঞানীরা আরও বলেন, Rapid Eye Movement (REM) নামক পরীক্ষা দ্বারা জানা যেতে পারে ঘুমন্ত ব্যক্তির আত্মা কি কি দেখেছিল। ঘুমন্ত ব্যক্তি নিজেও সব অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে পারে না। যদি আল্লাহ্‌তাআলা ইচ্ছা করেন তখন একটা স্বপ্ন মনে থাকে। অনেক সময় এ ধরনের স্বপ্নে ভবিষ্যদ্বাণীও থাকে যা পূর্ণ হয়ে থাকে।

প্রশ্ন নং ১১ ঃ ইংরেজী নববর্ষকে আমরা দোয়ার মাধ্যমে সাধারণতঃ স্বাগত জানিয়ে থাকি। অন্য কোন বর্ষপঞ্জির নববর্ষকে কি আমাদের স্বাগত জানানো উচিত?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, বাঙ্গালীরা অবশ্যই বাঙ্গলা নববর্ষের প্রথমে দোয়া করতে পারেন। এটা নির্ভর করে তারা কোন বর্ষপঞ্জি অনুসরণ করে থাকে।

প্রশ্ন নং ১২ ঃ যাহারাল কাসাদো ফিল বার্‌রে ওয়াল বাহ্‌রে - জলে স্থলে সর্বত্র অনাচার। কুরআন কোন্ অবস্থা বুঝাতে গিয়ে এ কথা বলা হয়েছে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ বার্ ও বাহ্‌র শব্দ দ্বারা যথাক্রমে স্থল ও সমুদ্র বা জল বুঝায়। সর্বত্র অনাচার বলতে এখানে বুঝাচ্ছে যে, কোন স্থান বাকী নেই। সেটা জলভাগই হোক আর স্থলভাগই হোক। এ অবস্থাই হয়েছিলো আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের সময়ে। কোন স্থানই সে সময় অনাচার থেকে মুক্ত ছিলো না। বাহ্‌র শব্দ দ্বারা আধ্যাত্মিক অর্থে ধর্মীয় নেতাদের বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ তাদের মধ্যেও অনাচার ছড়িয়ে পড়েছিলো। কেউ বাকী ছিলো না।

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ এটা কি সত্য নয় যে দুনিয়াতে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে বেশির ভাগই ধর্মের কারণে হয়েছিল?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ না, এ ধারণা ঠিক নয়। অনেক ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ এমন কারণেও হয়েছিল যেখানে ধর্মের কোন সম্পর্কই ছিল না। যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) নাৎসী জার্মানী শুরু করেছিল। সেই যুদ্ধের আদৌ কোন ধর্মীয় কারণ ছিল না। আরও বড় বড় যুদ্ধের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় তা ধর্মের কারণে হয় নি। যেমন ধর্ম রক্ষার খাতিরে কিছু যুদ্ধ হয়েছিলো। যখন ধর্মের নামে আঘাত এসেছে তখন আত্মরক্ষার জন্যে যুদ্ধ করা হয়েছে। তবে এর সংখ্যা খুবই কম।

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ দেশে থাকাকালে অনেক ছোট ছোট সেবা করার সুযোগ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যের লোকদের কীভাবে সেবা করা যায় বলে হুযূর মনে করেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এখানে অনেকে আছেন যারা সাহায্যের মুখাপেক্ষী। পুঁজিবাদী দেশ যেমন, আমেরিকা সেখানেও দরিদ্র আছে। কিছু খারাপ লোককে দেখা যায়, যারা মদ খায় বা নেশা করে- তারা নির্লজ্জভাবে অন্যের সামনে হাত পেতে টাকা পয়সা নেয়। এদেরকে বাদ দিয়ে এমন লোকও আছেন যারা সত্যি কষ্ট পাচ্ছেন। উপরোক্ত লোকদের কখনো সাহায্য করবেন না। কিন্তু পশ্চিমা দেশে বহুলোক হাস্‌পাতালে Old- peoples' home বা নির্জন গৃহে থাকে যাদের খোঁজ-খবর নেয়ার কোন লোক নেই। আপনারা এমন ধরনের ভাল কিন্তু অভাবগ্রস্থ লোকদের সাহায্য করতে পারেন।

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ ফিরিশ্‌তাগণ কি আল্লাহ্ তাআলাকে দেখতে পারেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ অবশ্যই । তবে জড় চোখ দিয়ে কেউ আল্লাহ্‌কে দেখতে পারে না। আল্লাহ্‌তাআলার গুণাবলীর মাধ্যমেই কেবল আল্লাহ্‌কে জানা সম্ভব। একবার হযরত আয়শা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিল, "মহানবী (সঃ) কি নিজের চোখে আল্লাহ্‌তাআলাকে দেখেছিলেন?" তখন হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন," এ প্রশ্ন এতই ভয়াবহ যে, আমার গা শিউরে উঠেছিল।" মহানবী (সঃ) পর্যন্ত চর্মচক্ষে আল্লাহ্‌তাআলাকে দেখেন নি সুতরাং ফিরিশ্‌তাগণেরও আল্লাহ্‌তাআলাকে সরাসরি দেখার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

(এ পর্যায়ে একটি উর্দূ নজম গেয়ে শুনান হয়।)

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ এক ব্যক্তির জীবনে যত পরীক্ষা আসে ওগুলো সবই কি তার নিজের পাপের ফলস্বরূপ আসে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ সব নয়, আংশিক-ভাবে তার নিজের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষা আসে। আবার কিছু পরীক্ষা সরাসরি আল্লাহ্‌তাআলার কাছ থেকেও বাহ্যিক কোন কারণ ছাড়াই আসে তাকে পবিত্র করার জন্য। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌তাআলার নিকট দোয়া করেছিলেন, "হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে দেখাও কীভাবে আমি তোমার রাস্তায় "কুরবানী" দিতে পারি। ঐ ধরনের পরীক্ষা পাপের ফলস্বরূপ হয় না, পবিত্রকরণের জন্য হয়ে থাকে।

প্রশ্ন নং ১৭ ঃ একেশ্বরবাদী বা একত্ববাদী খৃষ্টান কাদেরকে বলা হয়?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ প্রথম দিকে আরবে এক বিরাট সংখ্যায় একত্ববাদী খৃষ্টান ছিলেন, তবে তারা সবাই মুসলমান হয়ে যান। ঈসা (আঃ)-এর যুগে তার অনুসারীরা একেশ্বরবাদী ছিলেন।তখন খৃষ্ট ধর্মের যতগুলো গোত্র ছিল তারা সবাই এক খোদায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু পরে St. Paul যখন খৃষ্টানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন তখন তিনি এই ভ্রান্ত ধারণা অর্থাৎ তিন খোদা বা ত্রিত্ববাদ-এর প্রচার করে খৃষ্ট ধর্মকে কুলষিত করলেন।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর মত একত্ববাদী খৃষ্টান যারা আরব দেশে ছিল তারা ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পর মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

প্রশ্ন নং ১৮ ঃ মরণের পরে শিশুরা বাবা-মার জন্যে সুপারিশ করতে পারবে কিনা।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, যদি শিশুকালে সন্তানের মৃত্যুর পর বাবা-মা ধৈর্য ধারণ করে থাকেন তো মৃত সন্তান আল্লাহ্‌তাআলার নিকট সুপারিশ করতে পারে আল্লাহ্‌তাআলা যেন তার বাবা-মার ঐ ধৈর্যের কারণে তাদের মঙ্গল করুন। এটা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বর্ণনা বা শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি।

প্রশ্ন নং ১৯ ঃ আমরা টুপি পরি কেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটা মুসলমানদের রীতি। এটা দায়িত্বশীলতাও সৃষ্টি করে। যারা মাথায় টুপি পরে রাস্তায় বের হয় সাধারণ লোকেরা তাদেরকে দায়িত্ববান মনে করে। যারা টুপি পরে না তাদেরকে লোকেরা দায়িত্ববান মনে করে না। আমরা যখন মসজিদে যাই তখনও আমরা টুপি পরি। নামাযের সময় মাথা ঢাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন নং ২০ ঃ কোনো দেশে যখন বিশ্বাসীদের কাউকে শহীদ করা হয় তখন সে দেশের জন্য বা সে জাতির কি পরিণাম নির্ধারিত হয়?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ যে ব্যক্তিকে এভাবে শহীদ করা হয় তার আধ্যাত্মিক মর্যাদা অনুসারে আল্লাহ্‌র পক্ষে থেকে অপরাধী জাতির উপর শাস্তি আসে। দেখুন আফগানিস্তানে হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ (রাঃ)-কে অন্যায়ভাবে শহীদ করা হয়েছিল এবং ঐ দেশের উপর এখন পর্যন্ত ভয়ংকর ধরনের শাস্তি লাগাতার আসছে।

সংকলন ও অনুবাদ-নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

চতুর্থ খেলাফতের বিশ বছরের বিশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা

(২য় প্রচ্ছদের পর)

১৯৮২ খৃষ্টাব্দ

নভেম্বর - ৫ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) খুতবা জুমুআয় তাহ্রীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণাকালে দপ্তর আওওয়ালের (প্রথম পর্যায়ের ১৯৩৪-১৯৪৪) মুজাহেদীনের কুবরানীকে চির-জাগরূক রাখার জন্যে তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রতি তাগিদপূর্ণ নসীহত করেন এবং তাহ্রীকে জাদীদের তৃতীয় দপ্তরের (১৯৬৬-১৯৮৪) দায়িত্ব লাজনা ইমাইল্লাহ্র ওপরে ন্যস্ত করেন।

ডিসেম্বর ২৬-২৮ ঃ চতুর্থ খেলাফতের অধীনে প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয় রাবওয়াতে এবং এতে ২ লক্ষ ২০ হাজার লোক উপস্থিত হন।

১৯৮৩ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী-২৮ ঃ মসজিদুল আকসাতে খুতবার মাধ্যমে হুযূর (আইঃ) সারা বিশ্বের আহমদীদেরকে দাঈ ইলাল্লাহ্তে পরিণত হওয়ার জোর তাগিদ দেন।

জুলাই -১২ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ঈদের খুতবায় খেদমতে খালক (সৃষ্টি-সেবা)-এর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা উপস্থাপন করেন। ইহা ব্যতিরেকে ঈদের খুশী সত্যিকার অর্থে লাভ করা সম্ভব নয়। এ জন্যে ঈদের আনন্দে নিজের গরীব ভাইদেরকে অংশীদার করার তাগিদ দেন। বন্ধুগণ এতে স্বতস্ফূর্তভাবে 'লাব্বায়েক' বলেন।

১৯৮৪ খৃষ্টাব্দ

এপ্রিল-২৬ ঃ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াইল হক জামাতে আহমদীয়ার ওপরে বাধ্য-বাধকতা আরোপ করার নিমিত্তে 'কাদিয়ানীদের নিষিদ্ধ ঘোষণা অর্ডিনেন্স' জারী করেন। অবস্থা এতই নাজুক হয়ে যায় যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-কে প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে যেতে হয়। ২৯শে এপ্রিল তিনি হিজরত করেন এবং লন্ডনে বসবাস আরম্ভ করেন।

নভেম্বর ১১ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) জামাতের লোকদের কুরআন হিফয (মুখস্ত) করার তাহরীক করেন।

১৯৮৫ খৃষ্টাব্দ

এপ্রিল ৫-৭ ঃ বৃটেনের টিলফোর্ডে যুক্তরাজ্য আহমদীয়া জামাতের ঐতিহাসিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৫টি মহাদেশের ৪৮টি দেশ থেকে হাজার হাজার আহমদী যোগদান করে।

১৯৮৬ খৃষ্টাব্দ

মার্চ ৪ ঃ হুযূর (আইঃ) জামাতের শাহাদত বরণকারীদের জন্যে 'সৈয়্যদনা বেলাল ফান্ড' এর প্রবর্তন করেন।

১৯৮৭ খৃষ্টাব্দ

এপ্রিল ৩ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) জুমুআর খুতবায় জামাতের বন্ধুগণকে এই উদ্দেশ্যে তাহরীক করেন যে, নিজেদের ভাবী সন্তানদেরকে এখন থেকেই ধর্মের সেবার জন্যে উৎসর্গ (ওয়াকফ) করা উচিত। প্রথমে এ তাহরীক ছিলো পাঁচ হাজার সন্তানের জন্যে। কিন্তু এখন ২০ হাজারেরও অধিক ছেলে-মেয়ে এ তাহরীকের অন্তর্ভুক্ত আছে এবং এ তাহরীক এখনও জারী আছে।

ডিসেম্বর ৪ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) 'আসীরানে রাহে মাওলা' (আল্লাহ্র পথে বন্দী)-দের খাতিরে সারা বিশ্বে নিষ্পাপ বন্দীদের মুক্তির জন্যে তাহরীক করেন।

ডিসেম্বর ৫ ঃ আহমদীয়তের কেন্দ্র রাবওয়াতে 'দারুল ইয়াতামা' (এতীমদের ভবন)-এর ভিত্তি রাখা হয়। এর নাম রাখা হয় **দারুল ইকরাম**।

ডিসেম্বর ২৫ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) "ওয়াকফে জাদীদ"-কে সারা বিশ্বের জন্যে নির্ধারিত করার ঘোষণা দেন। ওয়াকফে জাদীদের প্রবর্তন করেছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে।

১৯৮৮ খৃষ্টাব্দ

জুন-৩ ও ১০ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) জুমুআর খুতবায় বিরুদ্ধবাদীদের মুবাহালার আহ্বান জানান। এরপরে ১৭ই আগষ্ট আল্লাহ্তাআলা একটি অসাধারণ নিদর্শন দেখান। জেনারেল জিয়াউল হক অলৌকিকভাবে এক সর্বাধুনিক বিমানে ১১ জেনারেলসহ বিমান বিস্ফোরিত হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

১৯৮৯ খৃষ্টাব্দ

মার্চ-২৩ ঃ আহমদী জামাতের ভিত্তি রাখা হয়েছিল ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ। ১৯৮৯ সনে জামাত মহান আল্লাহ্তাআলার সকাশে কৃতজ্ঞতা উৎসব পালন করে। বাংলাদেশ জামাতও মহা সমারোহে এ উৎসব পালন করে।

১৯৯১ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' এ মাসে নিম্নলিখিত গুরুত্বপুর্ণ তাহরীকগুলো করেন ঃ

(১) ওয়াকফে জাদীদে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ ও মুয়াল্লিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি করণ।

(২) বিশ্বের নিরাপত্তা ও শান্তি এবং মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হওয়ার জন্যে দোয়ার তাহ্রীক।

(৩) আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদের জন্যে সারা বিশ্বের আহমদীদের নিকট সাহায্যের আবেদন।

(৪) উপসাগরীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার জন্যে আহমদীদের সদকা দেয়ার তাহ্রীক।

মার্চ ঃ হুযূর (আইঃ) এ মাসে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহরীকগুলো করেন ঃ

(১) সফলতা লাভ করার জন্যে বিধর্মী রাজনীতি পরিত্যাগ করে ধর্মীয় রাজনীতির নীতিসমূহের আত্মিকরণের তাহরীক।

(২) অন্য দেশের প্রতি নির্ভরশীলতা, জ্ঞান ও কৌশলাদিতে উন্নতি করা আর উদ্দেশ্যকে স্বচ্ছ করে মানবতাকে সঞ্জীবিত করার তাহরীক।

(৩) হুযূর (আইঃ) লাইবেরীয়ার মুহাজিরদের সাহায্যার্থে তাহরীক করেন।

(৪) মসনুন দোয়া করার তাহরীক

মে ঃ হুযূর (আইঃ) এ মাসে নিম্নোক্ত তাহ্রীকগুলো করেন ঃ

(১) জাপানে প্রথমে আহমদীয়া মসজিদ নির্মাণে যারা আর্থিক সাহায্য করেন তাদের জন্যে দোয়ার তাহ্রীক।

(২) ওয়াকফে নও শিশুদের তরবিয়ত দেয়ার ব্যাপারে বিশেষ পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের তাহ্রীক যেন তারা অন্যদের চাইতে আলাদা বলে দৃশ্যমান হয়।

(৩) সন্তান-সন্ততিকে সর্বদা খুতবা শুনার সাথে সম্পৃক্ত করার তাহরীক।

(৪) আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে সংরক্ষণের তাহরীক।

(৫) রাশিয়ায় তবলীগের কাজে বেশী বেশী ওয়াক্ফে আরযী করার তাহরীক।

ডিসেম্বর

এ বছরের একটি ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো কাদিয়ানে জামাতের শতবার্ষিকী জলসা সালানার অনুষ্ঠান। এতে ৪৪ বছর পরে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) যোগদান করেন।

১৯৯২ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ঃ সারা বিশ্বের ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও স্বচ্ছল ব্যক্তিদেরকে কাদিয়ানে শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করার তাহ্রীক।

২৯ শে অক্টোবর ঃ মৌলবাদী দুষ্কৃতকারী কর্তৃক ঢাকা দারুত তবলীগ আক্রান্ত। পৌণে ২ কোটি টাকার সম্পদের ক্ষতি।

জানুয়ারী ৩১ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা ইউরোপে প্রথম বারের মত স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেখা ও শুনা যায়।

আগষ্ট ২১ ঃ হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা ৪টি মহাদেশেই স্যাটেলাটের মাধ্যমে প্রচার আরম্ভ হয়।

১৯৯৩ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ১০-১২ ঃ আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ৬৯তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ১২ তারিখে হুযূর (আইঃ) এম.টি.এর মাধ্যমে জলসায় যোগদানকারীদের উদ্দেশ্য প্রথম বারের মত নসীহতমূলক ভাষণ দেন।

এপ্রিল ৯ ঃ জুমুআর খুতবায় হুযূর (আইঃ) গরীব পরিবারের মেয়েদের বিয়েতে সাহায্যের জন্যে একটি ফান্ড গঠন করার তাহরীক করেন।

প্রথম আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠান

জুলাই ৩১ ঃ যুক্তরাজ্যের ২৮তম সালানা জলসার সময় ২ লক্ষেরও অধিক লোক ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর হাতে বয়াতের মাধ্যমে আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হন।

সেপ্টেম্বর ১৭ ঃ হুযূর (আইঃ) জুমুআর খুতবায় বলেন, আল্লাহ্তাআলার সাহায্যের বায়ু এখন প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছে; এজন্যে নও মুবায়েঈনদের (নবদীক্ষিত) ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি দেয়া হোক।

১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ৭ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) 'আহমদীয়া মুসলিম টেলিভিশন'-এর সম্প্রচার রীতিমত উদ্বোধন করেন।

ফেব্রুয়ারী ২৩ ঃ চন্দ্রগ্রহণ ও সুর্যগ্রহণের শতবার্ষিকী পালিত হয় রাবওয়ার সহ বিশ্বের সবস্থানে।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠান

জুলাই ৩১ ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত বৃটেনের ২৯ তম সালানা জলসা উপলক্ষ্যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৯৩টি দেশের ১৫৫টি জাতির ১২০টি ভাষায় ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ২শ' ৬ ব্যক্তি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর পবিত্র হাতে নব সংযোজিত স্যাটেলাইট-এর মাধ্যমে বয়াত হয়ে আহমদীয়া জামাতে অংশ গ্রহণ করেন।

ডিসেম্বর ২৩ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বন্ধুগণকে নসীহত করেন। তারা যেন বছরের শেষ দিনগুলো দোয়া ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে অতিবাহিত করেন।

১৯৯৫ খৃষ্টাব্দ

জুলাই ঃ জামাতে আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ৩০তম সালানা জলসা 'ইসলামাবাদ'-এ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে 'ডিশ'-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বয়াতে ৯৬টি দেশের ১৬২টি জাতির ১২০ ভাষায় ৮,৪৫,২৯৪ জন লোক হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর পবিত্র হাতে বয়াত হয়ে সেলসেলা আলিয়া আহমদীয়ায় প্রবেশ করে।

১৯৯৬ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ৫-৭ ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর ৭২ তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ৩০০০এরও বেশি লোক যোগদান করেন।

এপ্রিল ঃ এম. টি. এর ২৪ ঘন্টা প্রোগ্রাম শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত সাহেব (আইঃ) একটি ঈমানবর্ধক ভাষণ দেন।

'ইসলামী উসুল কি ফিলাসফী'-এর একশ' বছর পূর্তি অনুষ্ঠিত হয়।

জুলাই ২৬-২৮ ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত বৃটেনের ৩১ তম সালানা জলসা অভূতপূর্ব সফলতার সাথে 'ইসলামবাদ' টিলফোর্ডে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৬৭ টি দেশের ১৩ হাজারেরও অধিক বন্ধু অংশগ্রহণ করেন। হুযূর (আইঃ) ৩ দিনই মূল্যবান ভাষণ দিয়ে জলসাকে মহিমামন্ডিত করেন। আন্তর্জাতিক বয়াতে ১৬ লক্ষেরও অধিক লোক অংশগ্রহণ করে আহমদী সেলসেলায় দাখিল হন।

অক্টোবর ২৫-২৭ ঃ বাংলাদেশে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ২৫তম সালানা ইজতেমা (রজত জয়ন্তী) অনুষ্ঠিত হয়।

ডিসেম্বর ২৭ ঃ ইসলামী নীতি-দর্শন পুস্তকের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকায় সর্বধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৯৭ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ৩-৫ ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশে-এর ৭৩তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

জানুয়ারী ১০ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিরুদ্ধবাদীদেরকে এ চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন যে, যে মিথ্যাবাদী আল্লাহ্তাআলা যেন তার ওপরে লা'নত বর্ষণ করেন।

মে ৩০ ঃ হুযূর (আইঃ) জুমুআর খুতবায় গরীব মিসকীনদের সেবা করার প্রতি বিশেষ তাগিদ প্রদান করেন।

জুলাই ২৫-২৭ ঃ ইউ, কে জামাতের ৩২তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৬৪টি দেশের ১৪ হাজার শ্রোতা উপস্থিত হন।

জুলাই ২৭ ঃ আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৯৬টি দেশের ২২১ টি জাতির ৩০,৩৪,৫৮৪ জন বয়াত করে আহমদীয়া জামাতে দীক্ষা নেন।

অক্টোবর ১০ ঃ হুযূর (আইঃ) Friday the 10th উপলক্ষ্যে জামাতকে নামায পড়ার বিশেষ বাণী প্রদান করেন।

অক্টোবর ৩১ ঃ হুযূর (আইঃ) তাহ্রীকে জাদীদের নব বর্ষের ঘোষণা করেন। ৮২টি দেশ থেকে ১৬,৬৪,৩৪০ পাউন্ড আদায় হয়।

ডিসেম্বর ১৮-২০ ঃ কাদিয়ানের ১০৬তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। হুযূর (আইঃ) লন্ডন থেকে উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন। ২৫টি দেশের ৫৫৯০ জন লোক যোগদান করেন।

১৯৯৮ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ঃ পাক্ষিক আহমদী কম্পিউটার কম্পোজ ও নতুন সাজে ছাপা আরম্ভ হয়।

জানুয়ারী ২ ঃ ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করেন হুযূর (আইঃ)। নির্দেশ দেয়া হয় প্রত্যেক জামাতের সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ যেন নও মুবাঈনদেরকে এতে অন্তর্ভুক্ত করেন।

ফেব্রুয়ারী ১৩-১৫ ঃ বাংলাদেশ জামাতের ৭৪তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিতি ৯৩টি জামাতের ৩৪২৭ জন।

জুন ৫ ঃ হুযূর (আইঃ) কর্তৃক এলুমিনিয়ামের বাসন-কোসন ইত্যাদি ব্যবহার না করার নির্দেশ।

জুলাই ৩১ -আগস্ট ২ ঃ জামাতে আহমদীয়া বৃটেনের ৩৩তম সালানা জলসায় ১৪ হাজার ব্যক্তির উপস্থিতি। হুযূর (আইঃ)-এর পুস্তক "Revelation, Rationality, Knowledge and Truth" প্রকাশিত হয়।

আগষ্ট ২ ঃ ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক বয়াতে ৯৩টি দেশের ২২৩ জাতির ৫০ লক্ষেরও বেশী লোকের অংশগ্রহণ।

আগষ্ট ৭ ঃ হুযূর (আইঃ)-এর পক্ষ থেকে সমস্ত দেশ জামাত, বিভাগ এবং বাড়ীতে "লাল খাতা" রাখার নির্দেশ।

আগষ্ট ঃ বাংলাদেশে প্রবল বন্যায় ২ কোটি লোক ক্ষতিগ্রস্ত। হুযূর (আইঃ) প্রধানমন্ত্রীর রিলিফ ফান্ডে ৫০ লক্ষ টাকা দান করেন।

নভেম্বর ৬ ঃ তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা। ১৬ লক্ষ ৮৬ হাজার পাউন্ড আদায়।

ডিসেম্বর ৫-৭ ঃ কাদিয়ানের সালানা জলসায় ২২টি দেশের ১৬ হাজার ব্যক্তির যোগদান। হুযূর (আইঃ) লন্ডন থেকে সরাসরি উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। ১০ হাজার নওমুবায়েঈনের যোগদান।

১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ২৯ ঃ খুতবা জুমুআয় আফ্রিকার দেশসমূহে বিশেষ করে সিয়েরালিওনের মুসলমান এতীম ও বিধবাদের সেবার জন্যে আন্তর্জাতিকভাবে তাহরীক করেন।

ফেব্রুয়ারী ৫-৭ ঃ বাংলাদেশ জামাতের ৭৫তম সালানা জলসায় ৩২৫৫ ব্যক্তি উপস্থিত হন। ১৬৭ জন বয়াত করেন।

মার্চ ২৮ ঃ লন্ডনের মসিজদ 'বায়তুল ফুতূহ' এর প্রস্তাবিত স্থানে হুযূর (আই]) ঈদুল আযহার নামায পড়ান। এতে ৮,৫০০ আহমদী যোগদান করেন।

মে ৬ ঃ ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ কেন্দ্রের বহুতল বিশিষ্ট কমপ্লেক্সের কাজ আরম্ভ হয়। হুযূর (আইঃ)-এর সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা ও দেশী বিদেশী বাঙ্গালী আহমদীদের অর্থানুকুল্যে এর প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয় সেপ্টেম্বর-২০০০ মাসে। প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী ছিলেন এর আর্কিটেক্ট ও প্রকৌশলী মীর শওকত আলীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে এর কার্য সুসম্পন্ন হয়। আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, ন্যাশনাল আমীর এর ভিত্তি রাখেন।

জুলাই ৩০-আগষ্ট ১ ঃ জামাতে আহমদীয়া বৃটেন-এর ৩৪তম সালানা জলসায় ২১ হাজার লোক উপস্থিত হন। ৩টি দেশের প্রেসিডেন্ট-এর বাণী পাঠ করে শুনানো হয়।

আগষ্ট ১ ঃ যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় ৭ম আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠানে ১০৪টি দেশের ২৩১টি জাতির ১ কোটি ৮ লক্ষ ২০ হাজার লোক বয়াত করেন।

আগষ্ট ১১ ঃ সূর্য গ্রহণ উপলক্ষ্যে হুযূর (আই ঃ) প্রথম বার লন্ডনে সালাতুল কুসুফ পড়ান এবং খুতবা দেন।

সেপ্টেম্বর ঃ হুযুর (আইঃ) অসুস্থতার কারণে দু'সপ্তাহের বিশ্রামের পরে Friday the 10th এর খুতবা দেন। হুযূর (আইঃ)- এর অসাধারণ স্বাস্থ্য লাভ খোদাতাআলার একটি বিশেষ নির্দেশনের রূপ ধারণ করে।

অক্টোবর ৩ ঃ জার্মানী জামাত 'মসজিদ দিবস' পালন করে।

অক্টোবর ৮ ঃ বাংলাদেশে খুলনাস্থ আহমদীয়া মসিজদ বায়তুর রহমানে জুমুআর খুতবার সময় বিরোধী কর্তৃক বোমা পেতে রাখার কারণে ৬ জন আহমদী সাথে সাথে এবং ১ জন আহত আহমদী হাসপাতালে শহীদ হন এবং মুরব্বী সেলসেলা মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব খুতবা দান কালে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পা হারান। শহীদরা হলেন ঃ (১) ডাঃ এম, এ, মাজেদ (২) সোবহান মোড়ল (৩) মুমতাজ উদ্দীন গাজী (১৫ দিন পরে হাসপাতালে মারা যান) (৪) জি, এম, মুহিবুল্লাহ্ (৫) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন (৬) জি, এম, আকবর হোসেন এবং (৭) নূরুদ্দীন। এরা সবাই জামাতের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন।

অক্টোবর ১৯ ঃ হুযূর (আইঃ) লন্ডনে 'বায়তুল ফুতূহ' মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর রাখেন। ইহা ইংল্যান্ডের মর্ডেনে অবস্থিত।

নভেম্বর ৫ ঃ হুযূর (আইঃ) তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করেন। ৯৪টি দেশের ১৭,৭১,৮০০ পাউন্ড আদায় হয় বিগত বছরে।

নভেম্বর ১৩-১৫ ঃ কাদিয়ানের জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয়। ২৭টি দেশের ২১ হাজার লোক উপস্থিত হন। এতে ১৬ হাজার নওমুবায়েঈন উপস্থিত হন।

ডিসেম্বর ২২ ঃ রমযানের পূর্ণিমার চাঁদ অসাধারণভাবে আলোকিত ছিলো। ১৩৩ বছর পর এ ঘটনা পুনরায় ঘটলো।

২০০০ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ৭ ঃ ওয়াকফে জাদীদের নতুন বর্ষের ঘোষণা। ১০০ দেশের অন্তর্ভুক্তি।

ফেব্রুয়ারী ৪-৭ ঃ বাংলাদেশ জামাতের ৭৬তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত সংখ্যা ৩৫১৬ জন। ১৮৪ জন বয়াত করেন জলসার সময়।

মার্চ ৪ ঃ খুতবা ইলহামিয়ার শতবার্ষিকী পালন।

জুন ১ - জুলাই ১১ ঃ হুযূর (আইঃ) ইন্দোনেশিয়ার ঐতিহাসিক সফর করেন।

জুলাই ৩০ ঃ ৮ম আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৭০টি দেশের ৪,১৩,০৮৩৭৫ জন লোক বয়াত করেন। এবারকার জলসায় ৭৭টি দেশ থেকে উপস্থিত ছিলো ২৩,৪০৭ জন।

আগষ্ট ১১-১২ ঃ ডাঃ আলেকজান্ডার ডুই এর পতনের শত বার্ষিকী পালিত হয়। উল্লেখ্য এ তথাকথিত এলীয় নবী হযরত মুহাম্মদী মসীহ (আঃ)-এর মুবাহালায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

অক্টোবর ঃ সৌদী আরব থেকে ত্রৈমাসিক আয্যোহার প্রথম সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়।

অক্টোবর ১৬-১৮ ঃ কাদিয়ানের ১০৯তম জলসা সালানা। ৩৫ হাজার লোক উপস্থিত হয়।

ডিসেম্বর ৮ ঃ দীর্ঘ ২ মাস অসুস্থ থাকার পরে হুযূর (আইঃ) জুমুআর খুতবা দিতে আসেন। তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা করেন। ১১০টি দেশের ১৯,৭৪,৬০০ পাউন্ড আদায় হয়।

ডিসেম্বর ১৫ ঃ একটি স্বপ্নের প্রেক্ষিতে হুযূর (আইঃ) রিশ্‌তানাতা ও বেকারদের সমস্যার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবার জন্যে তাহরীক করেন।

ডিসেম্বর ২৯ ঃ হুযূর (আইঃ) এ শতাব্দী ও সহস্রাব্দের শেষ খুতবা প্রদান করেন।

ডিসেম্বর ৩১ ঃ নতুন শতাব্দীতে কেউ যেন বেনামাযী হয়ে প্রবেশ না করে সেজন্যে জামাতের শতকরা ১০০ ভাগ নামাযী করার জন্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত। দিবা গত রাত্রে বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামায ও দোয়ার মাধ্যমে নতুন শতাব্দী ও সহস্রাব্দকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়।

২০০১ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ৫ ঃ হুযূর (আইঃ) জুমুয়ার খুতবায় ওয়াকফে জাদীদের ৪৪তম বছরের ঘোষণা করেন।

জানুয়ারী ২৬ ঃ সকাল আটটার সময় ভারতের গুজরাতে প্রলয়ংকারী ভূমিকম্পে প্রায় ১ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। জামাতে আহমদীয়া কৃতিত্বপূর্ণ সেবা প্রদান করে Humanity First কর্মসূচী -এর মাধ্যমে

ফেব্রুয়ারী ৯-১১ ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর ৭৭তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

ফেব্রুয়ারী ২৫ ঃ হুযূর (আইঃ) মোহতরম রফিক হায়াত সাহেবকে যুক্তরাজ্য জামাতের আমীর হিসেবে অনুমোদন দান করেন।

এপ্রিল ঃ হুযূর (আইঃ) আল্লাহ্‌র তাআলার গুণাবলীর ওপরে ধারাবাহিক খুতবা প্রদান শুরু করেন।

আগষ্ট ২৪-২৬ ঃ জার্মানীর মেইনহেমে আন্তর্জাতিক সালানা জলসা ২০০১ অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, গরুর খুরা রোগের কারণে বৃটেন সরকার প্রতি বারের ন্যায় লন্ডনে এ জলসা করার অনুমতি দেন নি। এ জলসায় প্রায় ৫০ হাজার নর-নারী অংশ নেন। ৫টি মহাদেশের ১৭৬টি দেশের কোটি কোটি লোক সাটেলাইটের মাধ্যমে এ জলসার কর্মসূচী দেখেন। এ জলসার আন্তর্জাতিক বয়াতে মোট ৮ কোটি ১০ লক্ষ ৬ হাজার ৭২১ জন লোক বয়াত করেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

সেপ্টেম্বর ঃ আমেরিকার তথাকথিত মসীহ্ মুহাম্মদী মসীহ্ (আঃ)-এর বদ্ দোয়ায় ধ্বংস্ প্রাপ্ত হওয়ার শতবর্ষ পূর্তি পালিত হয়।

অক্টোবর ২৪-২৬ ঃ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর ৩০তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

নভেম্বর ২ ঃ হুযূর (আইঃ) জুমুআর খুতবায় তাহরীকে জাদীদের নতুন বছর ঘোষণা করেন।

নভেম্বর ২-৭ ঃ মজলিসে আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ-এর ২৪তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

নভেম্বর ৮-১০ ঃ দারুল আমান কাদিয়ানের ১১০ তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। মোট উপস্থিতি ৫১ হাজার এরও অধিক।

ডিসেম্বর ৫ ঃ লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ-এর ১৫তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

২০০২ খৃষ্টাব্দ

জানুয়ারী ৪ ঃ হুযূর (আইঃ) জুমুআর খুতবায় ওয়াকফে জাদীদ এর ৪৫তম বছরের ঘোষণা করেন।

জানুয়ারী ১৩ ঃ জামাতের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক জনাব সাকিব যিরভী ইন্তেকাল করেন।

ফেব্রুয়ারী ৬-৮ ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর ৭৮তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

জুন ১০ ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আই) -এর খেলাফত কালের বিশ বছর পূর্ণ হয়।

সংকলনে ঃ **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

সংবাদ

বৃহত্তর সিলেট জেলার ২য় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

◆গত ৩/৫/২০০২ বৃহস্পতিবার সিলেট জেলার স্থানীয় কায়েদ সাহেবানদের নিয়ে ২য় ত্রৈমাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় সিলেট সদর মজলিসের মাহমুদ হাসান শিরজী সাহেবের বাসায়। কর্মশালায় দু'টি পর্ব ছিল প্রথম পর্ব রিপোর্ট পেশ ও রিপোর্টের উপর আলোচনা আগামী কর্মসূচী গ্রহণ। ২য় পর্ব ছিল তা'লীমের উপর আলোচনা।

হবিগঞ্জ জেলার আতফাল দিবস পালিত

◆গত ২৪/৫/২০০২ হবিগঞ্জ জেলার আতফালদের নিয়ে জামালপুর (হবিগঞ্জ) মজলিসে আতফাল দিবস পালন করা হয়। এতে কেন্দ্রের সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা ও অন্যান্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ জুমুআ স্থানীয় কায়েদ সোহেল আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ ও সমাপণী অধিবেশন আরম্ভ হয়।

- **আনোয়ার হোসেন চৌধুরী**
জেলা কায়েদ হবিগঞ্জ, মৌলবী বাজার

আতফাল দিবস পালিত হয়

গত ২৫/০৫/২০০২ সুন্দরবন মজলিসে আতফাল দিবস পালিত হয়, আল্হামদুলিল্লাহ্। উক্ত আতফাল দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে স্থানীয় আমীর সাহেব ও কায়েদ (সভাপতি হিসেবে) উপস্থিত ছিলেন।

- **এস, এম, আবূ সাঈদ**
নায়েম আতফাল, সুন্দরবন

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

আমি একজন ওয়াকফেনও (১৬৭৩-বি) আমার নাম মোছাঃ নাসিরুর রহমান ইনাব। আমি গত ২০০১ সালের জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় সেকেন্ড গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছি। আমি ভবিষ্যতে একজন ডাক্তার হতে চাই এবং জামাতের সেবা করতে চাই। এজন্য আমি সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

আতফাল দিবস ও বনভোজন-২০০২

নীলফামারী মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যাগে গত ০৩/০৫/২০০২ রোজ শুক্রবার নীলফামারী ও চড়াই খোলার সমন্বয়ে কানিয়াল খাতায় "আতফাল দিবস ও বনভোজন উদযাপন হয়। প্রতিযোগিতার বিষয়-বস্তু ছিল কুরআন তেলাওয়াত, নযম, আযান, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা, মোরগ লড়াই, দৌড় ও স্মৃতি শক্তি পরীক্ষা। নামায ও খাওয়া-দাওয়া শেষে সবাইকে নিয়ে দর্শনীয় স্থান "সাইফন' ভ্রমণ করা হয়। সমাপণী অধিবেশনে তিফলদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ মাহফুজার রহমান, সেক্রেটারী মাল-নীলফামারী, জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন ও জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন। বিচারকমন্ডলীর দৃষ্টিতে মোঃ আল হক, (চড়াইখোলা) "শ্রেষ্ঠ আতফাল" নির্বাচিত হন। এতে মোট ৯ জন তিফল, ১০ জন খাদেম, ৬ জন আনসার ও ১০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

রিজিওনাল কায়েদ সাহেব প্রতিযোগিদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন দোয়ার মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

- **মোঃ মোবাশ্বেরুল ইসলাম** (তপু)
মোতামাদ
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, নীলফামারী

শোক সংবাদ

শাহবাজপুর (নবীনগর) নিবাসী বেগম সাহারা আবদুল্লাহ্ গত ২১/৫/২০০২ তারিখ ৭২ বছর বয়সে ডাইবেটিক রোগ ও বার্ধক্যজনিত কারণে ঢাকাস্থিত বারডেম হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)। মরহুমা ছিলেন সৎ, ধার্মিক ও সাহসী। সম্ভবতঃ ১৯৪৩ সনে তিনি ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আগমন সংবাদ জানতে পেরে নিজ কনিষ্ঠা ভগ্নী রাবেয়া বেগম সহ বয়াত গ্রহণ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্যারিস্টার শামসুর রহমান সাহেবও আহমদী জামাত সম্পর্কে ভালভাবে অনুসন্ধান করে জামাতভুক্ত হন এবং মা-বাবার নিকট খবরটি জানান। পরবর্তীতে তাঁর পুরা পরিবারই আহমদী জামাতভুক্ত হয়ে যান। ফলে শাহবাজপুর গ্রামে এ ব্যাপারে ব্যাপক সাড়া পরে। মরহুমার স্বামী জনাব আব্দুল্লাহ্ সাহেব ও ব্যারিস্টার শামসুর রহমান সাহেব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত জামাতের খেদমত করে গেছেন। দোয়া করবেন তাঁরা যেন জান্নাতবাসী হতে পারেন। এবং মরহুমার পরিবারের সকলকে যেন আল্লাহ্তাআলা সাবরে জামীল দান করেন।

- **তফাজ্জল হোসেন**

মুনাজাতে রসূল (সঃ)

[রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়োত্তাপপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দোয়া]

মূল সংকলন ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ, রাবওয়া

(১৪তম কিস্তি)

কুরবানীর দিনের (ইয়াওমুন্নহর) - এর দোয়া

♦ হযরত জাবের (রাঃ) বিন আব্দুল্লাহ্ ইয়াওমুন্নহর (১০ই যিলহজ্জ কুরবানীর দিন)-এ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে ক্বরনুস্ সাআলাব নামক স্থানে এ দোয়া পড়তে শুনেছেন ঃ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا إِلٰـهَ إِلَّا أَنْـتَ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ
فَاكْفِنِيْ شَأْنِيْ كُلَّهٗ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ-
(كتاب الدعاء للطبرانی جلد ۲ صفحہ ۱۲۰۹ مطبوعہ بیروت)

(ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুমু লা ইলাহা ইল্লা আন্তা বিরহ্মাতিকা আস্তাগীসু ফাক্ফিনী শা'নী কুল্লহূ ওয়া লা তাকিলনী ইলা নাফসী তুরফাতা 'আইনীন-কিতাবুদ্দো'আ, তিবরানী প্রণীত, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১২০৯, বৈরুতে ছাপা)

অর্থ ঃ হে চিরঞ্জীবী-জীবনদানকারী, হে চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার অনুগ্রহে তোমার সাহায্য চাচ্ছি। আমার সর্বাবস্থার জন্যে তুমিই যথেষ্ট হয়ে যাও আর আমাকে এক মুহূর্তের জন্যেও নিজের কুপ্রবৃত্তির অধীনে ছেড়ে দিও না।

কাঁকর বা পাথর মারার সময়ের দোয়া

♦ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) পাথর মারার সময় প্রতিটি পাথর মারার সাথে সাথে **আল্লাহু আকবর** বলতেন আর এ দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَ ذَنْبًا مَّغْفُوْرًا-
(کتاب الدعا للطبرانی جلد ۲ صفحہ ۱۲۰۹ بیروت)

(আল্লাহুম্মাজ 'আলাহু হাজ্জাম্মাবরুরান ওয়া যাম্বাম্মাগফুরান- কিতাবুদ্ দো'আ তিবরানী প্রণীত ২ খন্ড, পৃষ্ঠা ১২০৯, বৈরুত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! এ হজ্জকে গৃহীত হজ্জ বানিয়ে দাও আর পাপগুলোকে ক্ষমা করে দাও।

ঈদের দিনের তকবীর

♦ হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বিন উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আয়্যামউল 'উশর (যিলহজ্জের প্রথম ১০ দিন)-এ বেশি বেশি **তকবীর** অর্থাৎ **আল্লাহু আকবর** (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ), তাহমীদ অর্থাৎ **আলহামদুলিল্লাহ্** (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র) ও **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্** (আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) পড়ার জোর তাগিদ দিতেন (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২ খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৫, বৈরুতে ছাপা)।

♦ হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বিন মাস'উদ মসনূন তাকবীরগুলোর মত পড়তেন ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ- (مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلوٰۃ)

(আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ- কিতাবুস্ সলাত, প্রণেতা ইবনে আবী শায়বা)।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যেই।

♦ হযরত উমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ৯ই যিলহজ্জ ভোর বেলা থেকে আইয়্যামুত্ তশরীকের শেষ দিন অর্থাৎ ১৩ই যিলহজ্জ আসর পর্যন্ত এসব তকবীর পড়তেন (মুস্তাদরাক হাকেম, ১ খন্ড, পৃষ্ঠ ২৯৯, বৈরুতে মুদ্রিত)।

♦ হযরত ইবনে উমর (রাঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিনে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় থেকে ঈদগাহ্ পর্যন্ত এ তকবীর পড়তেন (মুস্তাদরাক হাকেম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯৮ বৈরুত)।

জুমুআ ও ঈদের নির্ধারিত খুতবা

♦ হযরত জাবের (রাঃ) বিন সামরাহ্ বর্ণনা করেন। (জুমুআ বা ঈদের দিন) রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দু'টি খুতবা হতো। এদের মাঝে তিনি (চুপ করে) বসতেন। খুতবায় তিনি (সঃ) কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করে লোকদেরকে উপদেশ দিতেন (আবূ দাউদ, কিতাবুস্ সলাত)।

♦ হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, জুমুআর দিন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খুতবা এভাবে হতো যে, প্রথমে তিনি আল্লাহ্তাআলার প্রশংসা ও গুণ কীর্তন করতেন। এর পরে উঁচু আওয়াজে বাকী খুতবা দিতেন (মুসলিম, কিতাবুল জুমুআ)।

(ঈদের খুতবাতেও এ পদ্ধতিই ছিলো)

♦ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাস'উদ (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এ নির্ধারিত খুতবার কথাগুলো নিম্নরূপ ছিলো ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ
شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا
اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
(مسلم کتاب الجمعہ، ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ، ترمذی و ابن ماجہ کتاب النکاح)

আলহামদুলিল্লাহি নাহমাদুহূ ওয়া নাসতাঈনুহূ ওয়া নাস্তাগ্ফিরুহূ ওয়া নাউযুবিল্লাহি মিন শুরূরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিয়াতি আমালিনা মাঁইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহূ ওয়া মাঁইউযলিল ফালা হাদিয়ালাহূ ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকালাহূ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রসূলুহূ- মুসলিম, কিতাবুল জুমুআ, আবূ দাউদ, কিতাবুস সলাত, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্, কিতাবুন্ নিকাহ্)।

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই। আমরা তাঁরই প্রশংসা কীর্তন করি ও আমরা তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি আর আমরা তাঁরই কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি ও আমরা আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি আমাদের আত্মার প্ররোচনা হতে ও আমাদের কর্মের কুফল হতে, আল্লাহ্ যাকে সৎপথ প্রদর্শন করেন অতঃপর তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন অতঃপর তাকে কেউ পথ প্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি

যীশুর কবর কাশ্মীরে

সত্য চিরকালই সত্য। সত্যকে মিথ্যার আবরণে কখনও ঢেকে রাখা যায় না। সকল প্রকার বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে সূর্যালোকের ন্যায় সত্যের জ্যোতির্বিকাশ ঘটবেই। ইহা চিরন্তন সত্য কথা। একটা মিথ্যাকে লালন-পালন করতে করতে তা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় সমাজ দেহে শিকড় গেড়ে মজবুত হয়ে পরবর্তীতে ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিণত হয়। তখন সেই মিথ্যার মূল্য উৎপাটন করতঃ সত্যকে প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষা করার নিমিত্তে বিশ্ব-স্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌তাআলা যুগে যুগে প্রেরিত মহাপুরুষদেরকে ধরাধামে আবির্ভূত করেন।

এমন একদিন ছিল, যে দিন বৃটিশ রাজত্বে সূর্য অস্ত যেত না। বড় বড় উচ্চ পদে সবাই ছিল ইউরোপীয়ান ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান। খৃষ্টান জাতির ধর্ম বিশ্বাস একটি মিথ্যা স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন, খোদা এক খোদা, মরিয়ম এক খোদা, যীশু এক খোদা। তিনে এক একে তিন। তাদের বিশ্বাস মতে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ হেতু বাবা আদম পাপী ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে আদম সন্তান সকলেই পাপী। ঈশ্বর তাঁর এক মাত্র জাত পুত্র যীশুকে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন। ঈশ্বর পুত্র যীশু ক্রুশে রক্ত দিয়ে আদি পাপের প্রায়শ্চিত্য করতঃ স্বর্গে নীত হয়ে ঈশ্বরের ডান পাশে বসে আছেন। যেভাবে তিনি মেঘ রথে আরোহণপূর্বক স্বর্গে নীত হয়েছিলেন, সেরূপ মেঘ রথে আরোহণপূর্বক আবার তিনি পৃথিবীতে আগমন করতঃ স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। খ্রীষ্টান জাতির এরূপ 'শিরক' সম্বলিত বিশ্বাস যখন জগত জুড়ে প্রচার হচ্ছিল তখন শহরে বন্দরে ঘাটে গঞ্জে এমনকি পল্লীর নিভৃত কোণে গড়ে উঠেছিল প্রচার মিশন। পাদ্রীগণ বুদ্ধির সাহায্যে কৌশল ঘাটিয়ে সেবার নামে দরদী বন্ধু সেজে মক্তব মাদ্রাসা হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপন করতঃ আল্লাহ্‌র মনোনীত ইসলামের তৌহীদকে ধরা পৃষ্ট থেকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে এমন কোন ষড়যন্ত্র অবশিষ্ট রাখে নি যা প্রয়োগ করতে তারা বিন্দু পরিমাণ ত্রুটি করেছে। পানির মত অর্থ ব্যয় করেছে। ইসলাম ও মানবকুল শ্রেষ্ঠ হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছে যা স্তুপীকৃত করলে পর্বত সমান স্তুপ হবে। হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর ইন্তিকালের পর ইসলামের মহান বাণী প্রচারের মাধ্যমে বিশ্বের সকল জাতির সকল মানুষকে ইসলাম বা শান্তির পতাকা তলে এনে বিশ্বের বুকে শান্তি সুখের স্বর্গ রাজ্য গড়ে তোলার দায়িত্ব ছিল নায়েবে রসূলের দাবীদার আলেম-ওলামাগণের। খ্রীষ্টান পাদ্রী সমাজ বিভিন্ন ছলাকলার কায়দা-কৌশলের মাধ্যমে নায়েবে রসূলের দাবীদারগণকে পাড়িয়েছে ঘুম। তাদের সেই ঘুম আজো ভাঙ্গে নি। আল্লাহ্‌ জানেন তাদের এই ঘুম কবে নাগাদ ভাঙ্গবে। ত্রিত্ববাদী পাদ্রীগণ বিভিন্নভাবে হরেক রকম লোভ- লালসার প্রলোভনে মসনদ লাভের মোহমায়ার ফাঁদে ফেলে মুসলমান জাতিকে বিশেষ করে নায়েবে রসূলের দাবীদার আলেম ওলামাগণের মন-মস্তিষ্কে প্রক্ষিপ্ত করেছে খ্রীষ্টান জাতির সেই বিশ্বাস। "মরিয়ম পুত্র যীশু (ঈসা-আঃ) মরেন নি আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে সশরীরে জীবিত অবস্থায় তাঁর নিকটে তুলে নিয়েছেন। শেষ যুগে আবার তিনি আসমান থেকে নেমে এসে মুসলমান জাতিকে দাজ্জালের কবল থেকে উদ্ধার করবেন"। এরূপ বিশ্বাসের বশীভূত হয়েই হাজার হাজার মুসলমান খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। বহু আলেম পাদ্রীদের আক্রমণে ঘায়েল হয়ে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করতঃ হলো উল্টা পথের যাত্রী। ছলে-বলে, কলে-কৌশলে একই আল্লাহ্‌ রসূলের অনুসারী মুসলমান জাতিকে করল শতধা বিচ্ছিন্ন। এখনও তাদের লেজুড় ধরে মসনদ লাভের লোভ-লালসার ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থে নিজেরা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-কলহ মারামারিতে লিপ্ত। নেই একতা, নেই কোন নেতা, ভ্রাতৃত্ববোধ যেন চির বিদায় গ্রহণ করেছে। পাক কালামে আল্লাহ্‌তাআলা মুসলমান জাতিকে বলেছেন, "তোমরা ইহুদী খ্রীষ্টানগণকে বন্ধরূপে গ্রহণ কর না"। হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, "ইসলামের জন্য দজ্জালের চাইতে ভয়াবহ আর কিছুই নেই"। ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টানগণই যে দজ্জাল কুরআন হাদীসে উল্লেখ থাকলেও নায়েবে রসূলের নামধারীগণ দজ্জালকে চিনে উঠতে পারছে না। কেননা, ত্রিত্ববাদী দজ্জাল যে আজ তাদের পরম বন্ধু। এরূপ অবস্থাকেই পবিত্র কুরআন করীমে অন্ধ বোবা এবং বধির বলে আল্লাহ্‌তাআলা উল্লেখ করেছেন। তারা দেখেও দেখবে না, শুনেও শুনবে না। আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলামের উপর যখন নেমে এল অমানিশার ঘন ঘোর অন্ধকার এ অবস্থায়- "আমরাই এ যিক্‌র অবতীর্ণ করেছি আমরাই রক্ষক" (সূরাতুল হিজর)- আল্লাহ্‌তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে আখেরী যমানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করলেন। তিনি এসে আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশক্রমে ত্রিত্ববাদী দজ্জালের মোকাবেলায় খ্রীষ্টান জাতির মিথ্যা প্রচারণার বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হয়ে বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে জগদ্বাসীর সম্মুখে ঘোষণা করলেন, ত্রিত্ববাদী খ্রষ্টানদের খোদার পুত্র খোদা যীশু অন্যান্য নবী-রসূলের ন্যায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর কবর কাশ্মীরের শ্রীনগরে খান ইয়ার মহল্লায় অবস্থিত। আজ থেকে একশ' বছর আগে আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশে মানুষ মরণশীল জন্মিলে মরিতে হয়, এই চির সত্য কথা তিনি বিশ্ববাসীর সম্মুখে ঘোষণা দিলেন। তাঁর এই ঘোষণার আগে কেউই যীশুর মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা করে নি। কেননা, ইহা বিশ্ব-স্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌তাআলার কাজ। তাই আজ এর পক্ষে বিপক্ষে বিশ্বব্যাপী আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর এই ঘোষণায় ত্রিত্ববাদী দজ্জাল নির্বাক হয়ে গেল। খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার স্রোত থেমে গেল। কেননা, যীশুর (ঈসা-আঃ-এর) মৃত্যুতে ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টানগণের মিথ্যা স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ক্রুশীয় মতবাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলিবালির ন্যায় বিলীন হয়ে যায়, তাদের কোন ধর্মই থাকে না। তাই হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, "হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আগমন করতঃ 'ক্রুশ ধ্বংস করবেন' অর্থাৎ ক্রুশ মতবাদকে বিলুপ্ত করবেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ত্রিত্ববাদী দজ্জালের মোকাবেলায় আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে আহমদীয়া জামাত নামে এক সংগঠন স্থাপন করলেন। তারাই আজ ইসলামের বিজয়ের পতাকা হস্তে নিয়ে বিশ্বের কোণে কোণে ছড়িয়ে আছে। আহমদী মুসলিম জামাতের প্রচারকগণের মোকাবেলায় ত্রিত্ববাদী দজ্জাল আজ 'লবণের মত' গলে গিয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে নিজেদের জীবনকে ধন্য করছে।

মরিয়ম-পুত্র যীশু (ঈসা-আঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত একজন নবী ছিলেন। নবী ছাড়া তিনি আর

কিছুই ছিলেন না। নবী-রসূলের আগমনে সমসাময়িক আলেম ওলামা পীর পুরোহিত ও ধর্মযাজকগণ হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত সকল নবী রসূলের বিরুদ্ধেই উঠে-পড়ে কোমর বেঁধে লেগেছে। নানা প্রকার অত্যাচার-অবিচার যুলুম নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালিয়ে তাদের প্রাণ নাশের চেষ্টা করেছে। মরিয়ম পুত্র যীশুর (ঈসা আঃ-এর) বেলায় তাঁর কমতি কিছুই ঘটে নি, তাঁর প্রাণ নাশের জন্য তাঁকে ক্রুশে টাঙ্গানো হয়েছিল।

আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রসূলগণের নিজস্ব কোন ধ্যান-ধারণা থাকে না। ঐশী নির্দেশক্রমে তাঁরা তাঁদের কর্ম-জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁরা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌তাআলার প্রতি আত্মসমর্পণকারী হন। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁদেরকে যখন যা বলেন, তখন তাঁরা তা-ই করেন এবং তা-ই বলেন। বিপদাবলীর ভয়ে কখনও তাঁরা কাতর হন না।

ক্রুশের ঘটনার অনেক পূর্বেই আল্লাহ্‌তাআলা মরিয়ম-পুত্র যীশুকে (ঈসা-আঃ-কে) তাঁর বিরুদ্ধে ইহুদী আলেম উলামা পুরোহিত ও ধর্ম যাজকগণের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন যে, তাকে ক্রুশারোপিত হতে হবে। এই মর্মে ক্রুশের ঘটনার আগেই যীশু (ঈসা-আঃ) তাঁর শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন যে, "মনুষ্য পুত্রকে মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইবেন, তাঁরা তাকে বধ করবে। হত হলে পর তিনি তিন দিন পরে উঠবেন" (মথি ৯ঃ ৩১ ও ১০ ঃ ৩৩-৩৪)। "এ কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকেরা চিহ্নের অন্বেষণ করে; কিন্তু যোনা (ইউনুস-আঃ-এর) চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন ইহাদিগকে দেয়া যাবে না। কারণ যোনা (ইউনুস-আঃ) যখন তিন দিবা-রাত্র বৃহৎ মৎসের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্য-পুত্র তিন দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ভে থাকবেন" (মথি ১২ঃ ৩৯-৪১)। গালীলে তাঁর শিষ্যগণ একত্রিত হওয়ায় সময় যীশু (ঈসা-আঃ) তাঁদেরকে বলেছিলেন, "সম্প্রতি মনুষ্য-পুত্র মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইবেন, এবং তারা তাকে বধ করবে আর তৃতীয় দিনে তিনি উঠবেন" (মথি ১৭ ঃ ২২-২৩ ও মার্ক ১০ ঃ ৩৩-৩৪)। যীশুকে (ঈসা আঃ-কে) রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছিলেন, "আমি পালরক্ষককে আঘাত করব তাতে পালের মেষেরা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে" (সখরিয় ১৩ ঃ ২৬-৩১)। "তার এক খানি অস্থিও ভগ্ন হবে না।" (যাত্রা পুস্তক ১২ ঃ ৪৫ ও যোহন ১০ ঃ ৯ ঃ ৩৬)। "তারা যাকে বিদ্ধ করেছে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে" (সখরিয় ১২ ঃ ১০)। আসল কথা যীশুকে (ঈসা-আঃ-কে) ক্রুশারোপিত হতে হবে এ বিষয়ে তাঁর শিষ্যগণ পূর্বেই অবগত ছিলেন। তজ্জন্য তাঁরা আগে থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতঃ সুগন্ধি তেল ও ঔষধ পথ্যাদি তৈরী করে ছিলেন এবং যাতে নিরাপদে তাঁর সেবা -শুশ্রুষা করা যায় তজ্জন্য যোসেফ নামক তাঁরই একজন ধনবান শিষ্য, যিনি সৎ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন স্বয়ং একজন মন্ত্রীও ছিলেন তিনি তাঁর নিজস্ব বাগানে পাহাড়ের গুহায় একটি কবর খুঁড়ে রেখে ছিলেন যাতে রেখে যীশুকে সেবা-শুশ্রুষা করা যায়। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় যীশুকে (ঈসা-আঃ-কে) ক্রুশ থেকে নামানো হয় এবং শিষ্যদের সেবা -শুশ্রুষায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন। এবং পরে শীষ্যগণকে বলেন, "তোমাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে আমি তোমাদিগকে যা বলেছিলাম আমার সে বাক্য এই মোশির ব্যবস্থায় ও অন্যান্যদিগের গ্রন্থে এবং গীত- সংহিতায় আমার বিষয়ে যা যা লিখিত আছে সে সকল অবশ্যই পূর্ণ হবে" (লুক ২৪ ঃ ৪৪-৪৫)। "এই সকল ঘটিবে যেন শাস্ত্রীয় বচন পূর্ণ হয়" (যোহন ১৯ ঃ ৩৬)।

অতঃপর নবীগণের সুন্নত অনুযায়ী অতি গোপনে মালীর বেসে তিনি প্যালেস্টাইন থেকে হিজরত করতঃ আফগানিস্তান ইত্যাদি হয়ে কাশ্মীরে আগমন করেন। তখনকার কাশ্মীরের রাজার সঙ্গে তিনি দেখা করেন। কাশ্মীরবাসীদের কাছে তিনি ইউসু আসফ নামে পরিচিত। তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর সন্তানাদিও লাভ হয়। ১২০ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং শ্রীনগর খান ইয়ার মহল্লায় সমাধিস্থ হন। তাঁর অন্যতম শীষ্য টমাসের কবর মাদ্রাজে। মা মেরীর কবর পাকিস্তানের কোহমারী পাহাড়ে অবস্থিত।

এখানে একটি বিষয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি যে, আমাদের নবী খাতামান্নবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)। তিনি আমাদেরকে বলে গিয়েছিলেন, তাঁর পূর্ববর্তী কিতাব এবং নবীদের প্রতি বিশ্বাস রাখতে, তাইতো আমরা খ্রীষ্টানদের নবী যীশু (ঈসা-আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস রাখি যে, তিনি আল্লাহ্‌ প্রেরিত একজন নবী ছিলেন। তা না হলে আমাদের নবী তো মানবকুল শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) যার জন্য আল্লাহ্‌তাআলা আসমান-জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা সমুদয় সৃষ্টি করেছেন, সে রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) মরে গিয়ে মদীনার মাটির নীচে শুয়ে আছেন। আর খ্রীষ্টানদের নবী যীশু (ঈসা-আঃ) কিনা আসমানে সশরীরে জীবিত অবস্থান করছেন। আবার তিনি আসমান থেকে এসে হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর-ই অনুসারী মুসলমান জাতিকে উদ্ধার করেন। যুক্তি প্রমাণহীন কুরআন ও হাদীসের বিরুদ্ধে এরূপ অবান্তর আজগুবী ধ্যান-ধারণা ও কাল্পনিক বিশ্বাস দ্বারা হযরত নবী করীম (সঃ)-এর মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতঃ ঈমান হীনতার পরিচয় কিনা একজন বিবেকসম্পন্ন চিন্তাশীলের পক্ষে তা ভেবে দেখার বিষয়।

এ ধরার বুকে যদি কেউ বেঁচে থাকতেন কিংবা বেঁচে থাকার প্রয়োজন হতো তাহলে মানবকুল শ্রেষ্ঠ রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত রসূল করীম (সঃ)-ই বেঁচে থাকতেন। এই বিশ্বাস একজন খোদা-ভীরু ধর্ম-প্রাণ রসূল প্রেমিকের প্রকৃত ঈমানদারীর লক্ষণ।

- সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

সংবাদ

মহান সীরাতুন্নবী (সঃ) দিবসের কর্মসূচী পালন

পরবর্তীতে পাওয়া খবরে জানা যায় যে, নিম্নবর্ণিত জামাতগুলোও যথারীতি মহান সীরাতুন্নবী (সঃ) দিবসের কর্মসূচী পালন করেছেন ঃ খাকদন, ঘাটুরা, বগুড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, খুলনা, তেবাড়িয়া, শৈলমারী, ইসলামগঞ্জ, চরসিন্দুর, বরিশাল ও নাটাই জামাত।

খেলাফত দিবসের কর্মসূচী পালন

আরও যারা ২৭মে খেলাফত দিবসের সভা সম্মেলন করেছেন তারা হলেন, ঘাটুরা, খাকদন খাকদান-(কৃষ্ণনগর হালকা), কাফুরিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, খুলনা, হোসনাবাদ, আহমদনগর, ইসলামগঞ্জ, শৈলমারী, নিউ সোনাতলা, ডোহান্ডা ও বীরগাঁও জামাত। **- নির্বাহী সম্পাদক**

ফুলের তোড়া

(গুলদাস্তা)

[১০ থেকে ১৩ বছর বয়সে ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক]

মূল ঃ আমাতুল বারী নাসের ও বুশরা দাউদ

(১২ম কিস্তি)

কুরআন

শেষ পারার শেষ ১০টি সূরা মুখস্থ করো ঃ

১। সূরাতুল ফীল ২। সূরাতুল কুরায়েশ
৩। সূরাতুল মা'উন ৪। সূরাতুল কাওসার
৫ সূরাতুল কাফিরূন ৬। সূরাতুন্নাসর
৭। সূরাতুল্লাহ্‌ব ৮। সূরাতুল ইখলাস
৯। সূরাতুল ফালাক্ব ১০। সূরাতুন্নাস

দোয়া

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

(রব্বানা আফরিগ 'আলায়না সাবরাঁওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বওমিল কাফিরীন)

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের ওপরে ধৈর্য ক্ষমতা অবতীর্ণ করো। আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় রাখো ও কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

(আসতাগ্‌ফিরুল্লাহা রব্বী মিন কুল্লিযাম্বিওঁয়া আতুবু ইলায়হি)

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র কাছে নিজের প্রত্যেক পাপের ক্ষমা চাচ্ছি আর তাঁর দিকে ফিরে যাচ্ছি।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

(আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্‌! নিশ্চয় আমরা তোমার সত্তাকেই শত্রুর মোকাবেলায় রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি।

رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ

(রব্বিন সুরনী 'আলাল ক্বওমিল মুফসিদীন)

অর্থ ঃ হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী জাতির বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো।

হাদীস

اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ

(আদ্দালু 'আলাল খয়রি কাফা'ইলিহী)

অর্থ ঃ পুণ্য সম্বন্ধে যিনি সংবাদ দেন তিনি যেন পুণ্য কাজ সম্পাদনকারী।

عِدَةُ الْمُؤْمِنِ كَاَخْذِ الْكَفِّ

(ইদাতুল মু'মিনি কায়াখযিল কাফ্‌ফি)

অর্থ ঃ মু'মিনের প্রতিশ্রুতি এমনই সত্য যেভাবে কোন জিনিষ হাতে দিয়ে দেয়া হয়।

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا

(লায়সা মিন্না মান গশ্‌শানা)

অর্থ ঃ যে ধোঁকা দেয় সে আমাদের (মুসলমানদের) অন্তর্ভুক্ত নয়।

اَلسَّعِيْدُ مَنْ وُّعِظَ بِغَيْرِهٖ

(আস্‌সা'ঈদু মান উ'ইযা বিগয়রিহী)

অর্থ ঃ সৌভাগ্যশালী ঐ ব্যক্তি যে অন্যের অবস্থা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে।

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى

(আল্ ইয়াদুল 'উলইয়া খয়রুম্মিনাল ইয়াদিস্ সুফলা)

অর্থ ঃ নীচের হাতের (অর্থাৎ গ্রহীতার) চেয়ে উপরের (অর্থাৎ দাতার) হাত উত্তম।

لَا يَشْكُرُ اللّٰهَ مَنْ لَّا يَشْكُرُ النَّاسَ

(লা ইয়াশকুরুল্লাহা মাল্লা ইয়াশকুরুন্নাসা)

অর্থ ঃ যে মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না সে আল্লাহ্‌রও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ

(আত্বাইবু মিনায্‌যাম্বি কামান লা যাম্বালাহূ)

অর্থ ঃ পাপ থেকে তওবাকারীর অবস্থা এমন যেন সে পাপ করেই নি।

اِذَا جَآءَكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَاَكْرِمُوْهُ

(ইযা জায়াকুম কারীমু ক্বওমি ফাকরিমূহু)

অর্থ ঃ যখন তোমাদের কাছে কোন জাতির সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসেন তখন তাঁকে সম্মান করো।

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ

(সায়্যিদুল ক্বওমি খাদিমুহুম))

অর্থ ঃ জাতির সর্দার তাদের সেবক হয়ে থাকেন।

اَلْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ

(আল্ ইয়ামিনুল ফাজিরাতু তাদা'উদ্দিয়ারা বালাক্বিই)

অর্থ ঃ মিথ্যা শপথ ঘরগুলোকে বিরান করে দেয়।

নামায শিক্ষা

('ওয়াকফে নও' শিশুদের পাঠ্য-বিষয়ের ২২ পৃষ্ঠা থেকে ৩৫ পৃষ্ঠায় এসব রয়েছে বিধায় পুনঃ অনুবাদ করা থেকে বিরত থাকলাম-অনুবাদক]

নামাযের মসলা-মাসায়েল

নামাযের আরকান সম্বন্ধীয়

১। যদি নামাযী কোন কারণে দাঁড়াতে না পারে তাহলে বসে নামায পড়ে নেবে। নামাযে কুরআন পাঠের বেলায় কমপক্ষে একটি বড় আয়াত বা ৩টি ছোট আয়াতের সমান পড়তে হবে।

২। ক্বদাহ্‌তে এতটা সময় বসা আবশ্যক যতটা সময় লাগে আত্‌তাহিয়্যাত পড়তে।

নামাযের মুফসিদাত অর্থাৎ যাতে নামায নষ্ট হয়ে যায়ঃ

১। নামাযে কথা-বার্তা বললে

২। ব্যথা ও কষ্টের কারণে শব্দ করে কাঁদলে (কেবল আত্ম-বিগলন ব্যতিরেকে)।

৩। নিজের ইমামকে ছাড়া কুরআন পড়তে অন্য কেউ ভুল করলে তা বলা যাবে না। নিজের ইমামকে বললে নামায ফাসেদ হয় না।

৪। নামাযে কিছু খেলে বা পান করলে।

নামাযের মকরূহাত বা দোষণীয় ব্যাপার

১। চাদর বা লেফকে মাথা বা কাঁধে এমনভাবে রাখা যেন উহার আঁচল ঝুলতে থাকে বা কোট ও আলখেল্লা প্রভৃতির হাতায় হাত না দিয়ে পরা আর হাত উড়তে থাকা।

২। কপাল থেকে মাটি মুছে ফেলা।

৩। কাপড় মাটিতে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্যে টেনে রাখা বা উঠানো।

৪। নগ্ন মাথায় নামায পড়া।

৫। কপালের সম্মুখ থেকে বিনা প্রয়োজনে কাঁকর ও মাটি সরানো। অবশ্য যদি সিজদাহ্‌ দিতে অসুবিধা হয় তাহলে একবার সরিয়ে দেয়া বৈধ।

৬। নামাযে আঙ্গুল ফুটানো।

৭। নামাযে ডানে, বামে বা আকাশের দিকে তাকানো

৮। নামাযে হাই বা ঝিমুনি আসলে যথাসম্ভব এথেকে বিরত থাকা।

৯। সিজাদাহ্‌র সময় উভয় হাত মাটিতে বিছিয়ে দেয়া অথবা পেটকে উরুর সাথে মিলিয়ে ফেলা।

১০। বিনা প্রয়োজনে কাশি দেয়া। (চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

প্রসঙ্গ ঃ দাজ্জাল তার গাধা ও ইয়া'জূজ মা'জূজ

হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর মহান ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ইমাম মাহ্দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। যুগ-মসীহকে মান্য করার সৌভাগ্য আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে প্রদান করেছেন। কিন্তু জনসাধারণের নিকট যখনই সত্যিকার মসীহ্র পয়গাম প্রচারে অগ্রসর হই তখনই সর্বমহল হতে একটি প্রশ্ন সমস্বরে উঠে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যেভাবে বলেছেন মসীহ্ আসবে সেভাবেই তিনি বলেছেন, মসীহের যুগে দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। মসীহের অন্যতম কাজ হবে ঐ দাজ্জালকে সকলের সামনে পরিচয় করিয়ে দেয়া এবং তাকে বধ করা। কিন্তু আপনারা বলছেন, মসীহ্ এসেছে তাহলে দাজ্জাল কোথায়? কোথায় তার সে গাধা এবং ইয়া'জূজ-মা'জূজ? আর দাজ্জাল না আবির্ভূত হলে মসীহ্ এসে কি করলেন? তাহলে কি নবী করীম (সঃ)-এর মহান হাদীস মিথ্যা? (নাউযুবিল্লাহ্)। মিথ্যা হতেই পারে না। সুধী পাঠক! লেখার ভূমিকা না বাড়িয়ে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর হাদীস, আল্লাহ্ পাকের কালাম পবিত্র কুরআন মাজীদ-এর আলোকে দাজ্জাল সম্পর্কীত এ সকল প্রশ্নের উপযুক্ত সমাধান এবং তার পরিচয় দেয়ার জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস ঃ

রসূলে করীম (সঃ) দাজ্জাল ও তার গাধা ইয়া'জূজ-মা'জূজ সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এসেছে। এখানে আলোচনার জন্য তার মধ্য হতে কয়েকটি বর্ণনা নেয়া হয়েছে- দাজ্জাল এক চোখ বিশিষ্ট হবে, তার দক্ষিণ চোখ কানা হবে। তার কপালে কাফ, ফে, রে লেখা থাকবে, লেখা পড়া জানা বা না জানা প্রত্যেক মু'মিন পড়তে পারবে। তার সাথে জান্নাত, জাহান্নাম, আগুন ও পানি থাকবে, [বুখারী ও মুসলিম]। সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করার আদেশ দিবে। আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে। জমীনকে শস্য উৎপাদন করতে আদেশ দিবে জমীন তা উৎপন্ন করবে [মুসলিম-তিরমিযী]। তার সাথে রুটির পাহাড় ও পানির নহর থাকবে। সে বহু দুর্বল বিশ্বাসীর ঈমান হরণ করবে [মিশকাত] প্রভৃতি। কলেবর বৃদ্ধি না করে এগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করছি ঃ

হযরত ইমাম মাহ্দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) কর্তৃক ঐশী ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত একমাত্র জামাত, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, এ জামাতের বিশ্বাস বিভিন্ন হাদীসে দাজ্জাল সম্পর্কীত যে রেওয়ায়াত এসেছে তা সরাসরিভাবে কোন ব্যক্তি বা জন্তুকে বুঝায় না বরং রূপকভাবে বিশেষ এক জাতিকে বুঝিয়েছে। যাদের মধ্যে বর্ণিত গুণাবলী বিদ্যমান। কিন্তু বর্তমান কালের এক শ্রেণীর মাদ্রাসা পাশ আলেমের মতভেদ এখানে। তারা জোর গলায় ঘোষণা দেন রসূলে করীম (সঃ) রূপক কোন কথা বলতেই পারেন না, নাউযুবিল্লাহ্। তিনি (সঃ) যা বলেছেন সেই গুণাবলী সম্বলিত মানুষ / জানোয়ার জগতে অবশ্যই আবির্ভূত হবে। যে সকল শান্তিপ্রিয় ভাই নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন তাদের প্রতি আমার আকুল আবেদন আপনাদের চিন্তা করার যে শক্তি আল্লাহ্ পাক দিয়েছেন তা দিয়ে বিচার করুন এবং প্রকৃত মাহাত্ম্য উপলব্ধি করুন।

হযরত রসূলে করীম (সঃ) নিজে জীবনে বিভিন্ন সময়ে কোন রূপক ভাষা ব্যবহার করেছেন কিনা, সেদিকে পরে আসছি প্রথমে দেখি আল্লাহ্ পাক কী বলেন ঃ

'তিনিই তোমার উপর এই কিতাব নাযিল করেছেন যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন যেগুলি এ কিতাবের মূল। এবং অন্যগুলি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ রূপক (এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যাবাহী); কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা আছে তারা ফিৎনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং (অপ) ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে ঐ অংশের অনুসরণ করে যা পরস্পর সাদৃশ্য পূর্ণ রূপক। অথচ এর প্রকৃত ব্যাখ্যা জানেন কেবল আল্লাহ্ এবং জ্ঞানে পরিপক্ক লোকগণ। তারা বলে, আমরা এর উপর ঈমান রাখি সবই আমার প্রভুর পক্ষ হতে সমাগত বস্তুতঃ ধীমান ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না' [ইমরান ৮]

দেখুন এ আয়াত দ্বারা আমরা জানতে পারি আল্লাহ্পাক নিজে রূপক শব্দের অবতারণা করেছেন। তিনি যাকে বিশেষভাবে জ্ঞান দান করেন তিনিই এ সকল ব্যাখ্যাবাহী আয়াতের সঠিক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা দান করেন। দৃষ্টান্ত স্থলে- "এবং যখন তুমি কংকর নিক্ষেপ করেছিলে, তুমি নিক্ষেপ কর নি বরং আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছিলেন" (৮ঃ১৮)।

এখানে কি বদর প্রান্তে আল্লাহ্তাআলা নিজে নাযিল হয়ে কাফিরদের উপর আক্রমণ করেছিলেন, না মুসলমানদের সাহায্য করেছিলেন? এ প্রশ্নের জবাবে আমরা সকলে একবাক্যে স্বীকার করি যে, তিনি নিজে নাযিল না হয়ে মুসলমানদের মনোবলকে দৃঢ়তা দান করেছিলেন এবং কাফিরদের মনে ভীতি সঞ্চার করে তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করেছিলেন। অনুরূপভাবে বলেন- "নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু আল্লাহ্ যিনি আকাশমালা এবং পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন" (৭ঃ৫৫)। এই দিনের সাথে কি বাহ্যিক দিনের কোন বিন্দুমাত্র মিল পাওয়া যায়? অবশ্যই না। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন- "নিশ্চয় যারা তোমার হাতে বয়াত করে বস্তুতপক্ষে তারা আল্লাহ্র বয়াত করে। আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর আছে" (৪৮ঃ১১)। এ আয়াতকে যদি রূপকভাবে না নিয়ে সরাসরি অর্থে নেয়ার ধৃষ্টতা দেখান হয় তাহলে এমন অবস্থা হবে যা চিন্তা করা অন্যায়। কেননা, আল্লাহ্পাকের অস্তিত্বে যারা বিশ্বাস পোষণ করেন তারা সকলে মনে প্রাণে এ বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ অদৃশ্য। মানবীয় চোখে তাকে কখনও দেখা যায় না। কিন্তু এ আয়াতে বলা হয়েছে বয়াতকারীদের হাতের উপর তাঁর হাত থাকে। রসূলে করীম (সঃ)-এর হাতে তো অনেকে বয়াত নিয়েছিলেন কিন্তু কেউ কি আল্লাহ্র হাত দেখেছিলেন? তবে আল্লাহ্র কথা কি মিথ্যা। না অবশ্যই মিথ্যা নয়। কেননা, মিথ্যা হতেই পারে না। তাহলে নিশ্চয়ই অন্য অর্থ আছে এ আয়াতের। এ আয়াতসমূহকেই বলা হয় রূপক আয়াত। এ রকম শত শত আয়াত আছে পবিত্র কুরআন মজীদে। আল্লাহ্পাক রূপকের ব্যবহার এ জন্য রেখেছেন যে, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও অধ্যবসায়ী লোকগণ সঠিক চিন্তা শক্তির মাধ্যমে প্রকৃত মাহাত্ম্য উদ্ঘাটন করে প্রকৃত হেদায়াত লাভ করতে সক্ষম হবেন।

পবিত্র কুরআনে যেভাবে বহু স্থানে রূপকের ব্যবহার এসেছে সেভাবে হাদীস গ্রন্থেও রূপকের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। দৃষ্টান্ত স্থলে- একদা রসূলে করীম (সঃ) সকল স্ত্রীকে ডেকে বললেন- তোমাদের মধ্যে যার হাত লম্বা সে প্রথমে জান্নাতে যাবে। স্ত্রীগণ সকলে এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে না পেরে নিজেদের হাত মাপতে লাগলেন। তিনি (সঃ) হাসলেন, অতঃপর বললেন, তোমাদের বাহ্যিক

হাত নয় বরং যার দানের হাত লম্বা সে আগে জান্নাতে যাবে।

রসূলে পাক (সঃ)-এর কথা তাঁর স্ত্রীগণই বুঝতে পারেন নি আর এ যুগে যেভাবে মানুষ আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল সেখানে আল্লাহ্ পাক যদি বিশেষ জ্ঞান দান না করেন তবে কারো পক্ষে উপলব্ধি করা আদৌ সম্ভব নয়।

তিনি (সঃ) আরোও বলেন- 'ইমামের আগে যে সিজদাহ্ তোলে সে গাধা'। যদি কেউ ভুলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে সেজদাহ্ থেকে মাথা উঠায় তবে সেকি গাধা হয়ে যাবে? এ রকম রূপক শব্দের ব্যবহার তাঁর জীবনে অসংখ্য দেখতে পাই। বাংলা ভাষাতেও আমরা অহরহ রূপক ভাষার ব্যবহার করি। যেমন- "সোনা, সোনা, সোনা লোকে বলে সোনা সোনা নয় তত খাঁটি তার চেয়ে খাঁটি সে যে আমার বাংলাদেশের মাটি'। 'আমার সোনার বাংলা" প্রভৃতি এখানে সোনা বলতে সত্যিকার অর্থে সোনা বুঝিয়েছে? না অন্য কিছু?

নামের ক্ষেত্রেও আমরা রূপকের ব্যবহার পাই- শেরে বাংলা, বাংলার বুলবুল, আবূ হোরায়রা, সাইফুল্লাহ্, জুলকারনায়েন প্রভৃতি। এগুলোর সাথে বাস্তবতার কোন মিল নেই। কিন্তু এ সমস্ত কথা আমরা অহরহ ব্যবহার করে আসছি।

সুতরাং ভাষায় রূপকের ব্যবহার আছে এটা সর্বজনস্বীকৃত। আর আরবী ভাষা যেহেতু সকল ভাষার জননী (হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মিনানুর রহমান গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন) সেহেতু এ ভাষায় রূপকের ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। ভাষায় রূপকের ব্যবহারে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। মানব দেহে সোনা যেভাবে সৌন্দর্য প্রকাশ করে। সেভাবে ভাষায় রূপক শব্দ সৌন্দর্য প্রকাশ করে। এগুলোকে ভাষার অলংকার বলা হয়।

তাই আসুন দাজ্জাল সম্পর্কীত বিষয়টি নিয়ে গোঁড়ামীর উপর না থেকে বিবেকের বিচারে দন্ডায়মান হই তাহলে, ইনশাআল্লাহ্ প্রকৃত মাহাত্ম্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হব।

প্রথম প্রমাণ ঃ রসূলে করীম (সঃ) দাজ্জাল ও তার গাধা এবং ইয়া'জূজ-মাজূ'জ সম্বন্ধে যে সকল লক্ষণ বা চেনার উপায় বর্ণনা করেছেন তা তাঁর কাশ্‌ফ বা রুইয়ায় দেখা। কাশ্‌ফ ও রুইয়া সব সময়ই ব্যাখ্যাবাহী হয়। এখন বিষয়গুলো সামান্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি। প্রথমে 'দাজ্জাল' আভিধানিক অর্থে দাজ্জাল দ্বারা এক জাতিকে বুঝায়। এই শব্দটির ৬টি অর্থ হতে পারে। যেমন - ১। মহা মিথ্যাবাদীদের দল, যারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য করে দেখায়। ২। উটের সারা দেহে আলকাতরা মালিস করার মত পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলা। ৩। সর্বদা ভ্রমণকারী। ৪। মহা ধনী ও বিত্তশালী। ৫। বিরাট এক দল যারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ৬। ব্যবসায়ীর দল যারা বাণিজ্য করে ফেরে। কুরআন, হাদীস এবং বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনায় ইহাই প্রতীয়মান হবে যে, উপরে বর্ণিত অর্থ একটা বিশেষ জন্তু বা প্রাণীকে নয় বরং বিশাল এক জাতি বা গোষ্ঠীর প্রতি অংগুলি নির্দেশ করছে যে, প্রকৃতপক্ষে এরাই দাজ্জাল। প্রথম প্রমাণ ঃ হাদীসে বলা হয়েছে 'দাজ্জাল এক চক্ষু বিশিষ্ট হবে। তার দক্ষিণ চক্ষু কানা হবে" (বুখারী ও মুসলিম)। দেখুন জগতে অনেক অন্ধ ব্যক্তি আছেন, যারা জন্মগতভাবে বা পরবর্তীতে অসুখ-বিসুখে বা কারো দ্বারা আঘাত পেয়ে চোখ অন্ধ বা কানা হয়ে গেছে। এর মধ্যে অনেকের তো ডান চোখ কানা। যদি ডান চোখ কানা হয় তাহলে হাদীসের বর্ণনাতে সে দাজ্জাল। বিষয়টি কি এতটা সহজ? আরও ব্যাখ্যা যদি কোন ডান চোখ কানা ব্যক্তি শোনেন তাহলে নিশ্চয়ই স্বাভাবিক থাকবেন না। তাহলে এ হাদীসের সত্যিকার অর্থ কী? আবার দেখুন কুরআন বলেছে, 'যে ব্যক্তি এ দুনিয়ায় অন্ধ থাকবে সে পরকালেও অন্ধ থাকবে'। তাহলে কি অন্ধ ব্যক্তির দুনিয়াতে নেক কর্মের কোন মূল্য নেই? যিনি বিভিন্ন কারণে দুনিয়ায় অন্ধত্ব বরণ করেছেন পরকালেও যদি তিনি অন্ধ থাকেন তাহলে তার চাওয়া-পাওয়ার কি বা থাকলো? তবে এ আয়াত কি ভুল? অবশ্যই না। তবে অর্থটাকে সরাসরি না নিয়ে রূপকভাবে নিলে সমস্যা সমাধান হতে পারে। তবে প্রথমে দেখি আল্লাহ্ পাক কুরআন মজীদে চোখ বলতে কি বুঝিয়েছেন। আসল কথা **এই যে, বাহ্যিক চক্ষু অন্ধ হয় না, পরন্তু অন্ধ হয় তার হৃদয় যা বক্ষে থাকে** (২২ ঃ ৪৭)। দেখুন কুরআনের আয়াত কত স্পষ্টভাবে এর সমাধান প্রদান করেছে। আল্লাহ্ পাকের কাছে বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই। তাঁর নিকট মূখ্য হল অন্তর। সুতরাং যার অন্তরের চোখ কানা সে-ই প্রকৃতপক্ষে কানা হিসাবে বিবেচিত হবে। আয়াতের আলোকে এখন যদি হাদীসের অর্থ এই করা হয় যে, দজ্জাল দুনিয়ার চোখ দ্বারা দুনিয়াবী সকল কাজ করতে সক্ষম হবে কিন্তু তার হৃদয় অন্ধ হওয়ার কারণে আধ্যাত্মিক জগতের খাতা একেবারে শূন্য হবে। খৃষ্টান জাতি আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করায় পরকালে আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না। কাজেই এরা দাজ্জাল।

প্রমাণ-২ ঃ দাজ্জালের কপালে কাফ, ফে, রে লেখা থাকবে। লেখা পড়া জানে না এমন মু'মিন পড়তে পারবে। মু'মিন না হলে পড়তে পারবে না (বুখারী ও মুসলিম)। হাদীসের কথাগুলো যদি সরাসরি গ্রহণ করি তবে দেখুন কারও কপালে লেখা থাকলো কাফ, ফে, রে (কাফের), যিনি পড়তে পারেন তিনি না হয় পড়লেন কিন্তু যিনি পড়তে পারেন না বা আরবী অক্ষর চিনেন না তিনি কীভাবে পড়বেন? আবার রসূল (সঃ) শর্ত আরোপ করেছেন, কেবলমাত্র মু'মিন হলে পড়তে পারবে। মু'মিন না হলে যতই আরবী জানা লোক হোক না কেন পড়তে পারবে না। কী আশ্চর্য! এক তো লেখা-পড়া না জানলেও পড়তে পারবে আবার মু'মিন না হলে লেখা-পড়া জানলেও পড়তে পারবে না। এক কথায় দাজ্জাল চিনতে হলে মু'মিন হ'তে হবে। হাদীসটি ভালভাবে বোঝার জন্য আমরা কুরআনের সাহায্য নিতে পারি- আল্লাহ্ পাক বলেন- "তারা অবশ্যই কুফরী করেছে যারা বলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্- তিনিই মরিয়মের পুত্র মসীহ্ (৫ঃ১৮)। এ আয়াতের ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন নেই। মু'মিনদের চেনার সুবিধার্থে কুরআনের মধ্যেই আল্লাহ্ পাক বর্ণনা করেছেন যে, যারা মরিয়মের পুত্র মসীহ্‌কে খোদা বলে তারাই কাফির। এ আয়াতের আলোকে যদি বর্ণিত হাদীসকে সামনে রাখি তাহলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, যিনি ইসলামের প্রকৃত খেদমত করেন, বহু প্রতিকুল অবস্থায় অন্তরে ইসলামকে ধারণ করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে মু'মিন হয়েছেন তিনি কপালে লেখা কাফিরকে সহজে সনাক্ত করতে পারবেন। এখানেই এ হাদীসের প্রকৃত তাৎপর্য। কেয়ামতের দিন তাদের স্থান হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। কেননা, তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন- **তারা বলে রহমান আল্লাহ্ (নিজের জন্য) পুত্র গ্রহণ করেছেন। নিশ্চয়ই তোমরা এক গুরুতর কথা বলছো। আকাশসমূহ ফেটে যাওয়ার এবং পৃথিবী বিদীর্ণ হওয়ার এবং পর্বতমালা খন্ড-বিখন্ড হয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। কারণ তারা রহমান আল্লাহ্‌র প্রতি পুত্র আরোপ করেছে। অথচ রহমান আল্লাহ্‌র পক্ষে সমীচীন নয় যে, তিনি কোন পুত্র গ্রহণ করেন** (১৯ঃ৮৯-৯৩)। দেখুন আল্লাহ্ পাকের কতখানি রাগ এ জাতির প্রতি। তিনি সব ক্ষমা করবেন কিন্তু শিরককারীদের কখনও ক্ষমা করবেন না। ঈসা (আঃ)-কে খোদার পুত্র এ ধর্মমত এতটা ভয়াবহ যে, আকাশ, পৃথিবী, পর্বতসমূহ এ ভয়ঙ্কর বিশ্বাসের দরুন ধ্বসে পড়তে চায়। এ বিশ্বাস সকল ঐশী সত্যসমূহের বিরোধী। অথচ পরিতাপ! যাদের

সম্বন্ধে মহান আল্লাহ্‌তাআলা এ ভয়াবহ শব্দ উচ্চারণ করেছেন তাদেরকে বন্ধু করে আরব-বিশ্ব তথা বর্তমান আলেম সমাজ দাজ্জাল বা তাদের বিরুদ্ধে একমাত্র জেহাদ ঘোষণাকারী দল জামাতে আহমদীয়াকে নিশ্চিহ্ন করার পাঁয়তারা করে চলেছে। এর ভয়াবহতা ইনশাআল্লাহ্‌ খুব তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারবেন। এ আলোচনা হতে এটাই প্রমাণ হয় যে, দাজ্জাল কোন একক শক্তি বা জন্তু বা জানোয়ার নয় একটা বিশাল জাতি যারা প্রতিনিয়ত আল্লাহ্‌ পাকের সমকক্ষ হিসেবে এক মানুষ রসূল এবং তার মাকে (মরিয়ম) দাঁড় করেছে। অথচ তাদের খোদা ঈসা (আঃ) নিজেই বলেছেন- **হে বনী ইস্রাঈল! তোমরা উপাসনা কর আল্লাহ্‌র যিনি আমারও প্রভু-প্রতিপালক ও তোমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক** (৫ঃ৭৩)।

এ হাদীস ও কুরআনের আয়াত হতে যদি আপনি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস পোষণ করেন যে, দাজ্জাল কোন অবাস্তব বা অকাল্পনিক জন্তু নয় বরং একটি জাতি তাহলে পরবর্তী হাদীস আপনার সামনে পানির মত বুঝতে সহজ হবে।

তৃতীয় প্রমাণ ঃ প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ (আঃ) লুদ শহরে এসে জনগণের নিকট দাজ্জালের পরিচয় করাবেন। তিনি পরিচয় নির্দেশ করে দেখিয়ে দিবেন যে, এই সেই দাজ্জাল (মুসলিম)। এ হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক ১৮৯১ সালে লুধিয়ানা শহরে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ঘোষণা করেন যে, "খৃষ্টান পাদ্রীগণ দাজ্জাল"। তারা সকল নবী প্রদত্ত তৌহীদের শিক্ষার বিপরীত তিন খোদার প্রচার করে থাকে। এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে খোদা বলে পূজা করে। সুতরাং কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী এরাই দাজ্জাল। তিনি (আঃ) দাজ্জালকে পরিচয় করে দেয়ার পর হতে অদ্যবধি জামাতে আহমদীয়ার পক্ষ হতে ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে কলমী জেহাদ অব্যাহত আছে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

চতুর্থ প্রমাণ ঃ হাদীসের বর্ণনা - তাদের মধ্যে যে কেউ দাজ্জালের দেখা পাবে, সে যেন সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত এবং শেষ দশ আয়াত পাঠ করে (মুসনাদে ইমাম হাম্বল) পবিত্র কুরআন খুলুন দেখুন সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াতে ভ্রান্ত খৃষ্টান ও তাদের ভ্রান্ত মতবাদ সম্বন্ধে সাবধান করা হয়েছে। এবং কৃষ্টি ও সভ্যতায় তাদের আশ্চর্য উন্নতি ও ধ্বংস সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। প্রথম অংশে আল্লাহ্‌ পাক বলেন- 'ওয়া ইয়ুন জিরাল্লাযীনা কালুত্‌তাখাজাল্লাহু ওয়ালাদা" অর্থাৎ এবং যেন ইহা ঐ সকল লোকদের সতর্ক করে যারা বলে, আল্লাহ্‌ এক পুত্র গ্রহণ করেছেন"। কুরআনের এ আয়াত কাদের সতর্ক করছে' তাদের, যারা আল্লাহ্‌র উপর অপবাদ আরোপ করেছে এবং অহরহ তারা প্রচার করছে আল্লাহ্‌ তিনের মধ্যে তৃতীয়। এ আয়াত স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে, কারা দাজ্জাল। সুধী পাঠক চিন্তা করুন, কারা বলেন আল্লাহ্‌ নিজের জন্য পুত্র গ্রহণ করেছেন। কাদের বিশ্বাস আল্লাহ্‌ তিনের মধ্যে তৃতীয়? কারা প্রচার করেন একে তিন বা তিনে এক? এ সকল প্রশ্নকে সামনে রাখুন, অগ্রাধিকার দিন আল্লাহ্‌র বাণীকে মোল্লার বাণীকে নয় এবং নিরপেক্ষভাবে নিজের বিবেককে সিদ্ধান্তের দায়িত্ব দিন তাহলে আপনি নিশ্চিতভাবে দাজ্জালের পরিচয় পেয়ে যাবেন। এটা বিশেষ কোন প্রাণী নয় বরং বিশেষ জাতি। সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াতে ইয়া'জুজ ও মা'জূজ এর শিল্প ও প্রযুক্তি বিদ্যার অভূতপূর্ব প্রতিযোগিতামূলক উন্নতি, বিপুল সমর-সম্ভার ও পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ ও ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী এবং পরিণামে ইসলামের বিজয় ও আল্লাহ্‌ পাকের বাণীর বহুল প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। প্রথম অংশে দাজ্জাল সম্পর্কে হুশিয়ারী এবং শেষ অংশে ইয়া'জূজ- মা'জূজের কার্যাবলীর উল্লেখে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দাজ্জাল এবং ইয়া'জূজ-মা'জূজ একই সম্প্রদায়ের ভিন্ন নাম। লেখার শেষ অংশে ইয়া'জূজ ও মা'জূজ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত হাদীস দ্বারা দাজ্জাল বলতে বিশেষ কোন জন্তুকে নির্দেশ না করে বিশাল এক জাতিকে নির্দেশ করে আর তারা খৃষ্টান জাতি।

পঞ্চম প্রমাণ ঃ দাজ্জালের সাথে রুটির পাহাড় ও পানির নহর থাকবে। দাজ্জাল বহু দুর্বল বিশ্বাসীর ঈমান হরণ করবে (মিশকাত)। বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই শহরে-বন্দরে, পাহাড়ে-প্রান্তরে, জলে-স্থলে, আকাশ ও পাতালে যেখানে যেখানে খৃষ্টান জাতি বাস করে, বিচরণ করে তাদের সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য ও পানীয় থাকে। তারা তাদের প্রভাবাধীন জাতিগুলিকে খাদ্য-সামগ্রী দান করে, বিলিয়ে তাদের মূল্যবান ঈমান লুট করে। তাদের কবলে পড়ে গত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতীয় উপমহাদেশের ১৩ লক্ষ মুসলমান সহ প্রায় ২৭ লক্ষ সাধারণ মানুষ খৃষ্টান পাদ্রীদের থাবার শিকার হয়েছিলেন। এদের মধ্যে অনেক প্রখ্যাত মুসলিম আলেমও ছিলেন এবং পরবর্তীতে তারা খৃষ্টান পাদ্রীও হয়েছিলেন। দেখি কুরআন মজীদ ও হাদীস এ সম্পর্কে কোন দিকে নির্দেশ করছে- **"মরিয়মের পুত্র ঈসা বলিল, হে আল্লাহ্‌ আমাদের প্রভু! তুমি আকাশ হতে আমাদের জন্য খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা নাযিল কর যেন উহা আমাদের প্রথম অংশ ও শেষ অংশের জন্য ঈদস্বরূপ হয় এবং তোমার নিকট হতে এক নিদর্শন হয় এবং তুমি আমাদিগকে রিযিক দান কর এবং তুমি সর্বোত্তম রিযিকদাতা। আল্লাহ্‌ বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উপর ইহা নাযিল করব** (৫ঃ১১৫-১৬)।

পাঠক! এ আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) কাদের জন্য দোয়া করেছিলেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর জাতির জন্য দোয়া করেছিলেন। এবং পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র ওয়াদা ঐ দোয়ার প্রেক্ষিতে হয়েছে। তাই যতদিন পৃথিবী নামক গ্রহ থাকবে ততদিন আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ঈদের আনন্দের মত খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা নাযিল হতে থাকবে। সুতরাং রসূলে পাক (সঃ)-এর হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা করার কোন সুযোগ নেই। কেননা আল্লাহ্‌ পাক অপরিবর্তনীয় গ্রন্থে হাজার হাজার বিতর্কের সমাধান সন্নিবেশিত করে রেখেছেন। কেবল প্রয়োজন নিরপেক্ষভাবে মন নিয়ে অন্বেষণ করা। কুরআনের প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ জোর দিয়ে বলেছেন, 'যদি বাহ্যিক কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে তবে কুরআন শরীফ ৭ দিনে তোমাদিগকে পবিত্র করতে পারে" (কিশ্‌তিয়ে নূহ)।

সুতরাং হাদীসের বর্ণনা এবং পরবর্তীতে কুরআনের আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, তাদের হাতে খাদ্য থাকবে যাদের জন্য ঈসা (আঃ) পবিত্র দোয়া করেছেন। তাই এ অংশ দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টান জাতি দাজ্জাল।

৬ষ্ঠ প্রমাণ ঃ দাজ্জালের সাথে জান্নাত এবং দোযখ থাকবে। তার জান্নাত প্রকৃতপক্ষে দোযখ হবে। তার সাথে আগুন ও পানি থাকবে। লোকের চোখে যা পানি বলে পরিদৃষ্ট হবে তা প্রকৃত পক্ষে আগুন হবে। এবং যা আগুন বলে লোকে মনে করবে উহা প্রকৃত পক্ষে শীতল ও সুমিষ্ট পানি হবে (বুখারী ও মুসলিম)। এ হাদীসটি গভীর মনযোগের সাথে বিবেচনা করুন। জান্নাত এবং জাহান্নামের যে প্রতিশ্রুতি তা কেবল মৃত্যুর পরের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু এখানে দাজ্জালের নিকট পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। এথেকেও নিশ্চিত হওয়া যায় হাদীসটি রূপক বা ব্যাখ্যাবহ।

সম্বন্ধে মহান আল্লাহ্‌তাআলা এ ভয়াবহ শব্দ উচ্চারণ করেছেন তাদেরকে বন্ধু করে আরব-বিশ্ব তথা বর্তমান আলেম সমাজ দাজ্জাল বা তাদের বিরুদ্ধে একমাত্র জেহাদ ঘোষণাকারী দল জামাতে আহমদীয়াকে নিশ্চিহ্ন করার পাঁয়তারা করে চলেছে। এর ভয়াবহতা ইনশাআল্লাহ্‌ খুব তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারবেন। এ আলোচনা হতে এটাই প্রমাণ হয় যে, দাজ্জাল কোন একক শক্তি বা জন্তু বা জানোয়ার নয় একটা বিশাল জাতি যারা প্রতিনিয়ত আল্লাহ্‌ পাকের সমকক্ষ হিসেবে এক মানুষ রসূল এবং তার মাকে (মরিয়ম) দাঁড় করেছে। অথচ তাদের খোদা ঈসা (আঃ) নিজেই বলেছেন- **হে বনী ইস্রারাঈল! তোমরা উপাসনা কর আল্লাহ্‌র যিনি আমারও প্রভু-প্রতিপালক ও তোমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক** (৫ঃ৭৩)।

এ হাদীস ও কুরআনের আয়াত হতে যদি আপনি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস পোষণ করেন যে, দাজ্জাল কোন অবাস্তব বা অকাল্পনিক জন্তু নয় বরং একটি জাতি তাহলে পরবর্তী হাদীস আপনার সামনে পানির মত বুঝতে সহজ হবে।

তৃতীয় প্রমাণ ঃ প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ (আঃ) লুদ শহরে এসে জনগণের নিকট দাজ্জালের পরিচয় করাবেন। তিনি পরিচয় নির্দেশ করে দেখিয়ে দিবেন যে, এই সেই দাজ্জাল (মুসলিম)। এ হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক ১৮৯১ সালে লুধিয়ানা শহরে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ঘোষণা করেন যে, "খৃষ্টান পাদ্রীগণ দাজ্জাল"। তারা সকল নবী প্রদত্ত তৌহীদের শিক্ষার বিপরীত তিন খোদার প্রচার করে থাকে। এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে খোদা বলে পূজা করে। সুতরাং কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী এরাই দাজ্জাল। তিনি (আঃ) দাজ্জালকে পরিচয় করে দেয়ার পর হতে অদ্যবধি জামাতে আহমদীয়ার পক্ষ হতে ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে কলমী জেহাদ অব্যাহত আছে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

চতুর্থ প্রমাণ ঃ হাদীসের বর্ণনা - তাদের মধ্যে যে কেউ দাজ্জালের দেখা পাবে, সে যেন সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত এবং শেষ দশ আয়াত পাঠ করে (মুসনাদে ইমাম হাম্বল) পবিত্র কুরআন খুলুন দেখুন সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াতে ভ্রান্ত খৃষ্টান ও তাদের ভ্রান্ত মতবাদ সম্বন্ধে সাবধান করা হয়েছে। এবং কৃষ্টি ও সভ্যতায় তাদের আশ্চর্য উন্নতি ও ধ্বংস সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। প্রথম অংশে আল্লাহ্‌ পাক বলেন- 'ওয়া ইয়ুন জিরাল্লাযীনা কালুত্‌তাখাজাল্লাহু ওয়ালাদা" অর্থাৎ এবং যেন ইহা ঐ সকল লোকদের সতর্ক করে যারা বলে, আল্লাহ্‌ এক পুত্র গ্রহণ করেছেন"। কুরআনের এ আয়াত কাদের সতর্ক করছে' তাদের, যারা আল্লাহ্‌র উপর অপবাদ আরোপ করেছে এবং অহরহ তারা প্রচার করছে আল্লাহ্‌ তিনের মধ্যে তৃতীয়। এ আয়াত স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে, কারা দাজ্জাল। সুধী পাঠক চিন্তা করুন, কারা বলেন আল্লাহ্‌ নিজের জন্য পুত্র গ্রহণ করেছেন। কাদের বিশ্বাস আল্লাহ্‌ তিনের মধ্যে তৃতীয়? কারা প্রচার করেন একে তিন বা তিনে এক? এ সকল প্রশ্নকে সামনে রাখুন, অগ্রাধিকার দিন আল্লাহ্‌র বাণীকে মোল্লার বাণীকে নয় এবং নিরপেক্ষভাবে নিজের বিবেককে সিদ্ধান্তের দায়িত্ব দিন তাহলে আপনি নিশ্চিতভাবে দাজ্জালের পরিচয় পেয়ে যাবেন। এটা বিশেষ কোন প্রাণী নয় বরং বিশেষ জাতি। সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াতে ইয়া'জুজ ও মা'জুজ এর শিল্প ও প্রযুক্তি বিদ্যার অভূতপূর্ব প্রতিযোগিতামূলক উন্নতি, বিপুল সমর-সম্ভার ও পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ ও ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী এবং পরিণামে ইসলামের বিজয় ও আল্লাহ্‌ পাকের বাণীর বহুল প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। প্রথম অংশে দাজ্জাল সম্পর্কে হুশিয়ারী এবং শেষ অংশে ইয়া'জূজ- মা'জূজের কার্যাবলীর উল্লেখে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দাজ্জাল এবং ইয়া'জূজ-মা'জূজ একই সম্প্রদায়ের ভিন্ন নাম। লেখার শেষ অংশে ইয়া'জূজ ও মা'জূজ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত হাদীস দ্বারা দাজ্জাল বলতে বিশেষ কোন জন্তুকে নির্দেশ না করে বিশাল এক জাতিকে নির্দেশ করে আর তারা খৃষ্টান জাতি।

পঞ্চম প্রমাণ ঃ দাজ্জালের সাথে রুটির পাহাড় ও পানির নহর থাকবে। দাজ্জাল বহু দুর্বল বিশ্বাসীর ঈমান হরণ করবে (মিশকাত)। বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই শহরে-বন্দরে, পাহাড়ে-প্রান্তরে, জলে-স্থলে, আকাশ ও পাতালে যেখানে যেখানে খৃষ্টান জাতি বাস করে, বিচরণ করে তাদের সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য ও পানীয় থাকে। তারা তাদের প্রভাবাধীন জাতিগুলিকে খাদ্য-সামগ্রী দান করে, বিলিয়ে তাদের মূল্যবান ঈমান লুট করে। তাদের কবলে পড়ে গত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতীয় উপমহাদেশের ১৩ লক্ষ মুসলমান সহ প্রায় ২৭ লক্ষ সাধারণ মানুষ খৃষ্টান পাদ্রীদের থাবার শিকার হয়েছিলেন। এদের মধ্যে অনেক প্রখ্যাত মুসলিম আলেমও ছিলেন এবং পরবর্তীতে তারা খৃষ্টান পাদ্রীও হয়েছিলেন। দেখি কুরআন মজীদ ও হাদীস এ সম্পর্কে কোন দিকে নির্দেশ করছে- **"মরিয়মের পুত্র ঈসা বলিল, হে আল্লাহ্‌ আমাদের প্রভু! তুমি আকাশ হতে আমাদের জন্য খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা নাযিল কর যেন উহা আমাদের প্রথম অংশ ও শেষ অংশের জন্য ঈদস্বরূপ হয় এবং তোমার নিকট হতে এক নিদর্শন হয় এবং তুমি আমাদিগকে রিযিক দান কর এবং তুমি সর্বোত্তম রিযিকদাতা। আল্লাহ্‌ বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উপর ইহা নাযিল করব** (৫ঃ১১৫-১৬)।

পাঠক! এ আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) কাদের জন্য দোয়া করেছিলেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর জাতির জন্য দোয়া করেছিলেন। এবং পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র ওয়াদা ঐ দোয়ার প্রেক্ষিতে হয়েছে। তাই যতদিন পৃথিবী নামক গ্রহ থাকবে ততদিন আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ঈদের আনন্দের মত খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা নাযিল হতে থাকবে। সুতরাং রসূলে পাক (সঃ)-এর হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা করার কোন সুযোগ নেই। কেননা আল্লাহ্‌ পাক অপরিবর্তনীয় গ্রন্থে হাজার হাজার বিতর্কের সমাধান সন্নিবেশিত করে রেখেছেন। কেবল প্রয়োজন নিরপেক্ষভাবে মন নিয়ে অন্বেষণ করা। কুরআনের প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ জোর দিয়ে বলেছেন, 'যদি বাহ্যিক কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে তবে কুরআন শরীফ ৭ দিনে তোমাদিগকে পবিত্র করতে পারে" (কিশ্‌তিয়ে নূহ)।

সুতরাং হাদীসের বর্ণনা এবং পরবর্তীতে কুরআনের আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, তাদের হাতে খাদ্য থাকবে যাদের জন্য ঈসা (আঃ) পবিত্র দোয়া করেছেন। তাই এ অংশ দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টান জাতি দাজ্জাল।

৬ষ্ঠ প্রমাণ ঃ দাজ্জালের সাথে জান্নাত এবং দোযখ থাকবে। তার জান্নাত প্রকৃতপক্ষে দোযখ হবে। তার সাথে আগুন ও পানি থাকবে। লোকের চোখে যা পানি বলে পরিদৃষ্ট হবে তা প্রকৃত পক্ষে আগুন হবে। এবং যা আগুন বলে লোকে মনে করবে উহা প্রকৃত পক্ষে শীতল ও সুমিষ্ট পানি হবে (বুখারী ও মুসলিম)। এ হাদীসটি গভীর মনযোগের সাথে বিবেচনা করুন। জান্নাত এবং জাহান্নামের যে প্রতিশ্রুতি তা কেবল মৃত্যুর পরের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু এখানে দাজ্জালের নিকট পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। এথেকেও নিশ্চিত হওয়া যায় হাদীসটি রূপক বা ব্যাখ্যাবহ।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) কর্তৃক নির্দেশকৃত দাজ্জালের সাথে হাদীসটি রাখুন। অতঃপর বিবেচনা করুন। খৃষ্টান জাতি আজ তাদের ফলিত জ্ঞান- বিজ্ঞানের দ্বারা আরাম ও আয়েশ উপভোগের যে সব উপকরণ সৃষ্টি করেছে তা পার্থিব জগতে জান্নাতস্বরূপ। জান্নাতের অন্য অর্থ বাগান। খৃষ্টানগণ বাগান ঘেরা মনোরম অট্টালিকায় বাস করে। কিন্তু উহাতে মদ, নাচ ও ব্যভিচারের যে ব্যবস্থা থাকে তাতে ইসলামী পরিভাষায় এটিকে জান্নাত বলে মনে হলেও তা প্রকৃত পক্ষে জাহান্নাম। তাই রসূলে আকরম মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) বলেছেন, মানুষের মনে যা জান্নাত বলে মনে হবে তা-ই হবে জাহান্নাম। হাদীসের পরবর্তী অংশের দিকে একটু দৃষ্টি দিন। পানি জীবনের প্রতীক এবং আগুন কষ্টের প্রতীক। পানি স্বাচ্ছন্দ্য ও পার্থিব জীবন-নির্দেশক এবং আগুন পার্থিব কষ্ট - নির্দেশক। রমযান মাসে দৈহিক কষ্ট বরণ করে আমরা আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করি। রমযান শব্দ অগ্নি-নির্দেশক। সুতরাং এ লক্ষণে এটাই প্রকাশ করা হয়েছে যে, পাশ্চাত্য জাতির স্বাচ্ছন্দ্য পার্থিব জীবন প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক পতন ও দোযখের কারণ হবে। এবং তাদের চাল-চলনের বিপরীত সৎ ও সংযত জীবন কষ্টকর; কিন্তু আধ্যাত্মিক কল্যাণের কারণ হবে। অতএব হাদীস দ্বারা আমরা এটা বুঝি যে, পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যা খৃষ্টান জাতি জগতকে দান করছে তা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে আগুন। আর যারা এ সকল উপকরণকে পরিহার করে সংযমের সাথে কালাতিপাত করছে তা শীতল পানি।

সপ্তম প্রমাণ ঃ দাজ্জাল আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে আদেশ দিবে এবং আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে। জমীনকে সে শস্য উৎপাদন করতে আদেশ দিবে জমীন শস্য উৎপাদন করবে। অনুর্বর মাঠ তার আদেশে আপন ধন-ভান্ডার খুলে দেবে (মুসলিম ও তিরমিযী)। পাঠক হাদীসে বর্ণিত বিষয়সমূহ যদি কেউ সম্পন্ন করতে পারে তাহলে, নাউযুবিল্লাহ্ তার আল্লাহ্ হওয়ার আর কিছু বাকী থাকবে না। কেননা, কোন কিছু সৃষ্টি এবং ধ্বংস করার মালিক একমাত্র আল্লাহ্। তাই হাদীসটিকে বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করার কোন উপায় নেই। রূপকভাবে নিয়ে একটু বিশ্লেষণ করলেই প্রকৃত তত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব। আর তা হল- খৃষ্টান জাতি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বৃষ্টি বর্ষণ করতে সক্ষম। তারা আজ নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায়ে (সার, কিটনাশক প্রভৃতি) অবিশ্বাস্যভাবে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করছে। এমনকি আকাশের পানি না হলেও মাটির নীচের পানি দ্বারা ফসল উৎপাদন করছে মরুভূমি এবং কংকরময় এলাকায় এরা নানাবিধ যন্ত্র এবং সাজ-সরঞ্জাম দ্বারা তৈল, পেট্রোল, গ্যাস, হিরক, স্বর্ণ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ উত্তোলন করছে। আর এগুলো দেখে মনে হচ্ছে তাদের আদেশে আকাশ পানি দিচ্ছে। ফসলি ভূমি ফসল উৎপাদন করছে শেষ পর্যায়ে মরুভূমি তার আপন দুয়ার খুলে দিয়েছে। যদিও এ সকল যন্ত্রপাতি বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু এগুলো আবিষ্কারের জনক এ খৃষ্টান জাতি। কোন একক ব্যক্তি নয়। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "দাজ্জাল আপন শক্তি বিকাশে এ ব্যক্তিকে হত্যা করবে এবং পুনরায় জীবিত করবে" এ হাদীসের বাস্তবায়ন তো আমরা প্রতি নিয়ত চিকিৎসা ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এ শাস্ত্রের জনক কে? কেউ নয় বরং খৃষ্টান জাতি। সুতরাং হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, এ জাতি দাজ্জাল।

সুধী, উপরোক্ত হাদীস, কুরআন দ্বারা প্রমাণিত দাজ্জালকে যখন এ যুগের হেদায়াতকারী ও প্রতিশ্রুত সংস্কারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) পৃথিবীবাসীদের সামনে পরিচয় করিয়ে দিলেন যে, খৃষ্টান জাতি দাজ্জাল, সে দিন হতে শুরু হল সত্যিকার বিরোধিতা। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের সকল দুষ্ট পরিকল্পনা আল্লাহ্ পাক অসীম শক্তি দ্বারা নির্মূল করে দিয়েছেন। কেননা, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) বলেছেন-প্রতিশ্রুত মসীহ্ যখন দাজ্জালের দিকে তাকাবেন তখন লবণ যেমন পানিতে গলে যায় সে-ও তেমনিভাবে গলে যাবে (মুসলিম)। ১৮৯১ সালে লুধিয়ানায় পরাজিত হওয়ার পর হতে অদ্যবধি খৃষ্টান পাদ্রীগণ আহমদী কোন আলেম দূরে থাক, সামান্য একজন সদস্যের সাথে ধর্মীয় আলোচনায় আসতে সাহস রাখে না। কারণ এ যে সত্যিকার মসীহ্‌র দল। এর সামনে এলে পানির মধ্যে লবণের যে অবস্থা হয় সে অবস্থা তার হবে। এর বড় কারণ হলে তারা যাকে খোদার পুত্র খোদা বলে প্রার্থনা করে তার দুর্বলতা জামাতে আহমদীয়া প্রকাশ করে তাকে আর শত মানুষের মত বিশ্বাস করে। তাই এ হাদীস হতে একটি বিষয় পরিষ্কার দাজ্জালকে অস্ত্র বা তরবারী দ্বারা পরাজিত করা যাবে না বরং সে পরাজিত হবে কুরআনের মতে- যাদের বিশ্বাসকে যুক্তি এবং দলীল প্রমাণ দ্বারা নিঃশেষ করে দেয়া হয় কুরআনের ভাষায় তারাই প্রকৃত ধ্বংস প্রাপ্ত (৮ঃ৪০)। আর রসূলে পাক (সঃ) এ অর্থেই বলেছেন, লবণ পানিতে মিশে যাওয়ার অনুরূপ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত ঈসা (আঃ)-কে কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে অসংখ্য দলিল দ্বারা মৃত সাব্যস্ত করায় খ্রীষ্টিয় মতবাদ ভেঙ্গে চূরমার করে দিয়েছেন। তিনি খৃষ্টীয় মতবাদকে হত্যা করে জোর গলায় ঘোষণা দিয়েছেন, "তোমাদের খোদা মৃত আর জীবিত কেবলমাত্র মুহাম্মদ (সঃ)-এর খোদা। এ হাদীসের তাৎপর্য এখানে।

রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন, দাজ্জালের এক গাধা থাকবে (বায়হাকী)। তিনি (সঃ) কেবল মাত্র গাধা থাকবে বলেই শেষ করেন নি বরং গাধাকে সনাক্ত করার কতিপয় লক্ষণ বর্ণনা করেছেন যেন গাধাকে চিনতে শেষ জামানায় কারোও কোন অসুবিধা না হয়। কিন্তু তাঁর (সঃ) হাদীসকে প্রকৃত অর্থে বুঝতে না পেরে জগতে নানান বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পর গাধার বিষয়টি বিশ্লেষণ করা দরকার। কেননা, হাদীসে বলা হয়েছে, দাজ্জালের গাধা থাকবে। লেখার এ অংশে ধাপে ধাপে গাধা সম্পর্কিত হাদীসসমূহের সীমিত বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি ঃ

প্রথমত ঃ গাধার ২ কানের ব্যবধান হবে ৭০ গজ বা ১৪০ হাত (বায়হাকী) সুধী পাঠক, একবার সৎমন নিয়ে চিন্তা করুন। যদি হাদীসটিকে বাহ্যিকভাবে অর্থ করি তাহলে নিশ্চয়ই এক হাস্যরসের অবস্থা সৃষ্টি হবে। আমাদের মানব সমাজে দেখা যায় ৩/৪ হাত লম্বা একজন মানুষের কানের দুরত্ব মাত্র ৮/৯ ইঞ্চি। কিন্তু যে প্রাণীর কানের দূরত্ব ১৪০ হাত তার দেহের আকার কেমন হবে? আর সে প্রাণী চলাফেরা করবে কোথা হতে? যদি দাজ্জাল এই বাহন গাধাকে অবলম্বন করে চলাফেরা করে তবে দাজ্জালের কবলে পড়ার কোন সুযোগ নেই। কেননা, সে কখনও আমাদের সমাজে বা দেশে একবিন্দুও চলাফেরা করতে পারবে না। আর চলাফেরা না করতে পারলে আমাদের ক্ষতি করার কোন অবকাশ নেই। এখন প্রশ্ন তাহলে কি রসূল করীম (সঃ)-এর হাদীস ভুল, নাউযুবিল্লাহ্। হুযূর (সঃ)-এর কথা বা বাণী কোন মতেই ভুল হতে পারে না। আমাদের বোঝার ভুল হতে পারে। আমরা হাদীসটির বিষয়-বস্তুর প্রতি গভীর মনযোগের সাথে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই- কানের কাজ হচ্ছে কথা বা শব্দ যেগুলো দেখা যায় না তা ধারণ করে ব্রেনে পৌছে দেয়া। এখানে যদি কানের দূরত্ব বলতে

কোন বাহনকে নির্দেশ করি, যার কর্ণদ্বয় তার দুই সীমা নির্দেশ করে তাহলে হাদীসের অর্থ সর্বাঙ্গীন ও সুন্দর হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে ট্রেনের ইঞ্জিনে অবস্থিত ড্রাইভার ও সর্ব পিছনে গার্ড পরস্পরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে ট্রেনের কানের কাজ করে। এক্ষেত্রে ৭০ কেন ১০০ বা ২০০ গজ দূরত্বে কান এর অবস্থান থাকে তাহলেও হাদীসের বিকৃত অর্থ হওয়ার কোন সুযোগ নেই। পরবর্তী আলোচনা গভীর মনযোগেরই সাথে পড়লে, ইনশাআল্লাহ্ রসূল (সঃ)-এর দৃষ্টি কোন্ দিকে গিয়েছে তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন।

দ্বিতীয় ঃ গাধার কপালে চাঁদ থাকবে। তার মাথায় ধোঁয়ার পাহাড় থাকবে। আগুন পানি তার খাদ্য হবে। তার পেটের মধ্যে আলো এবং জানালা থাকবে। উহার মধ্যে বহু লোক এক সাথে প্রবেশ করবে এবং বের হয়ে আসবে। প্রবল ঝড়ের মুখে মেঘ যেমন উড়ে চলে তার গতি তদ্রূপ হবে। ৬ মাইল দূরে সে পা ফেলবে (মিশকাত)। সুধী, উপরে বর্ণিত হাদীসটি একটু বিবেচনা করুন। এ গাধা কেমন, যার কপালে থাকবে বিশাল চাঁদ, মাথায় থাকবে ধোঁয়ার পাহাড়, খাবার হবে আগুন ও পানি, পেটে জানালা এবং দরজা থাকবে আবার শত শত মানুষ পেটে যাবে এবং আসবে। ৬ মাইল অন্তর তার প্রতি পদক্ষেপ রাখবে। কোন প্রাণসম্পন্ন গাধার প্রসঙ্গে কি এ হাদীস প্রয়োগ করা যায়? কোন বিবেকবান মানুষের পক্ষে কি সম্ভব এ ধরনের কোন গাধার কথা চিন্তা করা? তাই বলবো, বিবেকহীনদের মত চিন্তা না করে আসুন হাদীস টিকে বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনা করি এবং বিবেকের বিচারে দন্ডায়মান করি তাহলে ইনশাআল্লাহ্ সফলতার চাবি হাতে এসে যাবে। পূর্ববর্তী হাদীসে গাধার যে দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে সেটির উপর হাদীসের বাণীকে প্রয়োগ করি তাহলে দেখুন রাত্রিকালে রেল বা জল জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদি যন্ত্রচালিত বাহনগুলোর কপালে পূর্ণ চাঁদের ন্যায় সার্চলাইটের আলো জ্বালিয়ে গন্তব্য পথে ছুটে যায়। যখনই এ বাহনগুলি চলে তখন মাথার উপর ধোঁয়া নির্গত হয় যা ধোঁয়ার পাহাড়ের নামান্তর। এ সকল বাহনের খাবার হয় আগুন ও পানি বা জলবৎ পেট্রল। বাহনসমূহের মধ্যে মানুষের যাতায়াতের জন্য বা প্রয়োজনীয় মালামাল বহন করার জন্য একাধিক জানালা, দরজা এবং বিজলী বাতি থাকে। সাধারণতঃ এ বাহনগুলি বিভিন্ন স্টেশনে থেমে থাকে যাকে প্রতি পদক্ষেপ ফেলার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, রসূল (সঃ) যে গাধার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সে গাধা কোন প্রাণযুক্ত কাল্পনিক গাধা নয় বরং প্রাণহীন গাধা যা আমরা এ অংশে দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপন করেছি। তবে এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে, এ বাহন তো আমরা সকলে হর হামেশা ব্যবহার করি, কিন্তু রসূল (সঃ) বিশেষ করে দাজ্জালের গাধা কেন বলেছেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ, আর তা হল- দাজ্জাল নামধারী (খৃষ্টান জাতি) প্রথমে নিজেরা ব্যবহার করার জন্য বাণিজ্য করার জন্য এ বাহন আবিষ্কার করেছে। এ বাহন নির্মাণের সকল কৃতিত্বের দাবীদার ঐ দাজ্জাল। তাই এ বাহনকে দাজ্জালের গাধা বলা হয়েছে। এতে রসূল করীম (সঃ)-এর বিচক্ষণতার এবং জ্ঞানের এক বিরল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

এখানে আবারো প্রশ্ন আসতে পারে যে, রসূল পাক (সঃ) এ বাহনকে গাধা কেন বললেন? গাধা বলার কারণ হল, তিনি (সঃ) দাজ্জাল সম্পর্কিত যে বর্ণনা দিয়েছেন তা ছিল দিব্য-দৃষ্টি বা কাশ্‌ফে দেখা। তিনি দেখেছিলেন এ ধরনের একটি বাহন যা মানুষ মালামাল প্রভৃতি বহন করছে। আর সে যুগে উট বা গাধা দ্বারা এ কাজ সমাধা হত। তাই তিনি সম্ভবতঃ গাধার নাম নিয়েছেন। সে যুগে ছিল না রেলগাড়ী, ছিল না জল জাহাজ, ছিল না পরিবহন ব্যবস্থার এত অগ্রগতি। তাই তিনি যদি গাধা না বলে এ ধরনের বাহনের কথা বলতেন তাহলে হাজারো প্রশ্নের সম্মুখীন হতেন। কেননা, সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি বাহন বা নাম বলে, রসূলে পাক (সঃ) যে গাধার নাম দিয়েছেন তাই বর্তমান জামানার সভ্যতার প্রয়োজনমত বা ব্যবহারমত যন্ত্রচালিত করে বিভিন্ন নাম দিয়েছে। দেখুন আমাদের আকা ও মওলা হযরতে মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) কতখানি বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি সেই যুগে খেজুর পাতার ঘরে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন ভবিষ্যতের সকল উন্নতি ঐ দজ্জালের দ্বারা সাধিত হবে। যেহেতু দজ্জালের দ্বারা সকল উন্নতি হবে সেহেতু দজ্জাল কর্তৃক নির্মিত বাহন দাজ্জালের বাহন বা গাধা হবে। এখানেই নাম করণের যথার্থতা বিবেচিত হয়। এবং রসূল (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা লাভ হয়।

উপরোক্ত হাদীসসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে দজ্জালের গাধা সম্পর্কিত বিষয়টি শেষ করছি। যদি আমাদের চিন্তা-চেতনার সাথে আপনার চিন্তা ধারার মিল খুঁজে পান তাহলে পরবর্তী চিন্তার খোরাক হিসাবে শেষ অংশে ইয়া'জূজ মা'জূজ-এর সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি ঃ

ইয়া'জূজ (Gog) মা'জূজ (Magog) ঃ বিভিন্ন সহীহ্ হাদীস গ্রন্থে রসূলে করীম (সঃ)-এর বর্ণনা এসেছে যদ্বারা ইয়া'জূজ ও মা'জূজ আবির্ভূত হলে তাকে সহজে চেনা যাবে।

১। ইয়া'জূজ - মা'জূজ প্রত্যেক উচ্চ স্থান হতে ছুটে আসবে, এদের কান লম্বা হবে, এতই লম্বা হবে যে, এক কান বিছিয়ে তার উপর ঘুমাতে পারবে। তারা উপসাগরের জল শোষণ করে শুকিয়ে ফেলবে, তারা যেখানে সেখানে ধ্বংস-লীলা সাধন করবে। এদের সাথে কেউ যুদ্ধ করার সাহস পাবে না। তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে ধ্বংস হবে (মিশকাত, মুসলিম, তিরমিযী)। রসূলে করীম (সঃ) এ সকল কথাই সত্য বলেছেন। কিন্তু এ হাদীসসমূহের আলোচনা করার পূর্বে ইয়া'জূজ - মা'জূজ পৃথিবীতে নতুন করে আসবে না, পৃথিবীতে যুগ যুগ ধরে অবস্থান করছে সে বিষয়ে প্রথমে নিশ্চিত হওয়া দরকার। এ কাজে আমরা কুরআনের সাহায্য নিতে পারি- "তারা বলল, হে যুলকারনায়েন ; নিশ্চয়ই ইয়া'জূজ - মা'জূজ এ দেশে বড়ই ফাসাদ সৃষ্টি করছে সুতরাং আমরা কি তোমাকে এ শর্তে কিছু কর দিব যাতে তুমি আমাদের এবং তাদের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক নির্মাণ করে দাও? সে (যুলকার নায়েন) বললো, এ সম্বন্ধে আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দান করেছেন উহা অনেক উত্তম। সুতরাং তোমরা আমাকে (শ্রম) শক্তি দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের এবং তাদের মধ্যে একটি মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করে দিব। এমন কি সে যখন ঐ দুই (পর্বত) শৃংগের মধ্যবর্তী স্থানকে ভরাট করে সমান করল। তখন (ইয়া'জূজ-মা'জূজ) তার উপর চড়তে পারল না এবং তাতে কোন ছিদ্রও করতে পারল না (১৮ ঃ ৯৫-৯৮)।

এ সকল আয়াত হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বর্ণিত ইয়া'জূজ-মা'জূজ পৃথিবীতে যুগ যুগ ধরে ছিল এবং এখনও আছে। তবে যুলকারনায়েন যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছিলেন তা ভেদ করে আসতে পারে নি।

সুধী, যে জাতি বা দল দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীতে অবস্থান করছে অথচ বর্তমান সভ্যতার স্বর্ণযুগে পৃথিবীর গন্ডি ছাড়িয়ে পাড়ি জমিয়েছে সুদূর গ্রহে-নক্ষত্রে। কিন্তু হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী কোন একটি জীবের সন্ধান মেলে নি। এ বিষয়টি কি আশ্চর্যের নয়? এ বিষয়টি নিয়ে কি

সামান্য চিন্তা করার প্রয়োজন নেই? চিন্তা করার দরকার হত না যদি এ কথাগুলো কোন সাধারণ লোক বলতেন। কিন্তু না, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মত সত্তার মুখ নিঃসৃত কথা এগুলো। তাই আসুন খোলা মন নিয়ে বোঝার চেষ্টা করি ঃ

রসূলে করীম (সঃ) ইয়া'জূজ-মা'জূজের যে ধারণা দিয়েছেন তার কোন অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। তবে এ কথাগুলো দাজ্জাল বা গাধা সম্পর্কীত হাদীসসমূহের মত সাদৃশ্যপূর্ণ রূপক যার বিভিন্ন ব্যাখ্যা এই ঃ

কুরআন করীমে ইয়া'জূজ-মা'জূজের যে বর্ণনা এসেছে তাদের অস্তিত্ব অতীতেও ছিল এখানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। নতুন করে কোন প্রাণী বা কাল্পনিক জন্তু আবির্ভূত হবে না। জুলকারনায়েন যে প্রতিবন্ধক নির্মাণ করেছিলেন ঐ প্রতিবন্ধকের মধ্যে বন্দী আছে। আল্লাহ্‌র হুকুম হলে ঐ লৌহ নির্মিত দেয়াল ভেদ করে পুনরায় বাইরে চলে আসবে (১৮ঃ৯৯)। এখন আমরা জুলকারনায়েন যে প্রতিবন্ধক নির্মাণ করেছিলেন তার বিষয়ে ইতিহাসের পাতায় নজর দেয়ার চেষ্টা করি। ইয়া'জূজ-মা'জূজ কৃষ্ণ সাগরের উত্তরে এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের রাজ্যসমূহ দখল করে ছিল। সাইরাস তাদের পরাভূত করে পারস্যবাসীকে তাদের কবল হতে মুক্ত করেন। (হিস্টারিয়ানস্ হিস্টরী অফ দি ওয়ালর্ড)। যে গিরি পথের মধ্য দিয়ে তারা পারস্য দেশ আক্রমণ করেছিল হিডোরাসের মতে ঠিক সেই স্থানে বিখ্যাত Derband (দারবান্দ) প্রাচীর দন্ডায়মান। এটি ককেশীয়া এবং কাশ্‌পিয়ান উপসাগরের পশ্চিমা তীরবর্তী স্থান এবং দক্ষিণ দিকে সমুদ্রাভিমুখে ৫০ মাইল দীর্ঘ ককেশাস প্রাচীরের দিগন্ত যা লৌহ দ্বার এবং কাশ্‌পিয়ান দ্বার এর সংকীর্ণ পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। এটা আসল অবস্থায় ২৯ ফুট উচ্চ এবং ১০ ফুট প্রস্থ (এনসাইক ব্রিট, দারবান্দ অধ্যায়)। অনেকে মনে করেন, এ প্রাচীর সম্রাট আলেকজান্ডার নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু অল্প বয়সে আলেকজান্ডারের মৃত্যু হওয়ায় তার সামরিক অভিযান ছিল ক্ষণিকের ঘূর্ণিবার্তার মত। সীমিত সময়ে তার পক্ষে এরূপ প্রকান্ড প্রাচীর নির্মাণ করা ছিল অসম্ভব। কিন্তু এ ধারণা মানব মনে উদ্রেক হওয়ার কারণ হ'ল মুসলমানগণ যুলকারনায়েনকে সাইরাস স্থলে আলেকজান্ডার বা সেকান্দর বাদশা বলে চিনতে ভুল করেছেন। ইনশাআল্লাহ্ নীচের বর্ণনায় প্রতীয়মান হবে যে, এ প্রাচীর সাইরাস নির্মাণ করেছিলেন। সাইরাস এর সময় বার বার ইয়া'জূজ-মা'জূজ (সিদিয়ানরা) পারস্যদেশ আক্রমণ করেছিল। কিন্তু তাঁর (সাইরাস) বিজয়ের পর এ সকল আক্রমণ বন্ধ হয়ে যায়। এ ঘটনা দ্বারা এ সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সাইরাস অবশ্যই এমন বাধা সৃষ্টি করেছিলেন যা সকল অভিযান কার্যকরভাবে বন্ধ করেছিল এবং সেই প্রতিবন্ধক ছিল Derband এর প্রাচীর যাকে ভুল করে আলেকজান্ডারের প্রাচীর বলা হয়।

আবার সাইরাস নিশ্চয় ইলহামযোগে খবর পেয়েছিলেন যে, সুদূর ভবিষ্যতে ইয়া'জূজ-মা'জূজ দক্ষিণ পূর্বে বিস্তার লাভ করবে, তখন এই প্রাচীর তাদের প্রতিরোধকে থামাতে পারবে না। তাই তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্‌র হুকুম হলে উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে এবং ইয়া'জূজ-মা'জূজ বাইরে বের হয়ে আসবে (১৮ঃ৯৯)। এ আয়াতে প্রাচীর চূর্ণ-বিচূর্ণ বলতে রূপকভাবে ইসলামের ক্ষতি বুঝিয়ে থাকে। বিশেষ করে ইউরোপের তুর্কী জাতির রাজনৈতিক ক্ষমতার পতন বা অবক্ষয় বুঝাতে পারে। তুরস্কের ক্ষমতার দুর্বলতার সাথে সাথে ইউরোপের খৃষ্টান জাতিসমূহের প্রাচ্য বিজয় সহজ করে দিয়েছিল। এবং খৃষ্টানদের এ অগ্রগতির মধ্য দিয়েই কুরআন পাকের আয়াতের পূর্ণতা লাভ হয়েছে। কুরআনে বর্ণিত জুলকারনায়েনই হ'ল সাইরাস। [সাইরাস এবং প্রাচীর সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদের ১৭১৯-১৭৩৪ নং টীকা (দেখুন)] সুতরাং ইতিহাস পর্যালোচনায় আমরা জানতে পারলাম যে, কুরআনে বর্ণিত যে প্রাচীর তা সাইরাস জুলকারনায়েন) নির্মিত Derband প্রাচীর। এবং এ প্রাচীরের আড়ালে ছিল আজকের প্রাচ্য জাতি। যারা মুসলমানদের দুর্বলতার সাথে সাথে বাইরে বের হতে সক্ষম হয়েছে। এরা কোন কাল্পনিক প্রাণী নয় বরং বিরাট এক জাতি। হযরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এক হাদীস পাওয়া যায় যেখানে বলা হয়েছে, ইয়া'জূজ-মা'জূজ প্রতিদিন পাহাড় ও লৌহ প্রাচীরের অবরোধ ভেদ করার জন্য নানা রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে (কুরআনের শ্রেষ্ঠ কাহিনী, ২৩০ পৃঃ) এ বর্ণনা হতেও ইয়া'জূজ ও মা'জূজ পৃথিবী হতে বিলীন হওয়ায় কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না বরং প্রমাণ পাওয়া যায় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ চলমান অবস্থায় যেকোন সময় বের হবে।

তাই আসুন ইয়া'জূজ ও মা'জূজ সম্পর্কীত বর্ণনাসমূহ দাজ্জাল ও তার গাধার বর্ণনার মত রূপকভাবে নিয়ে বিশ্লেষণ করি। রসূলে পাক (সঃ) ইয়া'জূজ ও মা'জূজ সম্পর্কে যে কথা বলেছেন রূপকভাবে তাদের উন্নতির চরম স্থানকে বুঝায়। তাদের উচ্চ স্থান হতে ছুটে আসা এবং কান লম্বা বলতে দূর হতে শোনার ব্যবস্থার দিকে ইঙ্গিত করছে। বর্তমানে স্যাটেলাইট এর মাধ্যমে টেলিফোন, বেতার, টেলিভিশন প্রভৃতির দ্বারা পৃথিবীর এক প্রান্তের ঘটনাবলী অন্য প্রান্তে বসে তাৎক্ষণিক জানতে ও উপলব্ধি করতে পারি। এই ইয়া'জূজ ও মা'জূজের কল্যাণে আমরা এসব প্রযুক্তি লাভ করেছি। এ জাতি বিভিন্ন খাল খননের মাধ্যমে বড় বড় সাগরকে শুকিয়ে ফেলছে। তারা যেখানে যাচ্ছে সেখানে ধ্বংসলীলা সাধন করছে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করার সাহস কারো নেই। যদি কেউ হাদীসের কথাকে অমান্য করে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হয় তবে তার অবস্থা কী হবে তা বলার অপেক্ষাই রাখে না! আমাদের সামনে তো ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন প্রভৃতির তাজা নিদর্শন বিদ্যমান। তাদের সাথে যুদ্ধ না করে অপেক্ষা করতে হবে। কেননা, রসূলে পাক (সঃ) বলেছেন, তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে ধ্বংস হবে (মিশকাত)। প্রকৃতপক্ষে দজ্জাল এবং ইয়া'জূজ ও মা'জূজ একই সম্প্রদায়ের জাতীয় জীবনের দু'প্রকার পরিচয় বহনকারী নাম। ধর্ম কৃষ্টি ও সভ্যতার লোভে তারা দজ্জাল এবং রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির ক্ষেত্রে তারা ইয়া'জূজ ও মা'জূজ।

সুধী পাঠক, আমরা এ লেখার মধ্য দিয়ে সীমিত জ্ঞানের পরিসর থেকে কুরআন হাদীস ও নিজস্ব চিন্তা-চেতনার সাহায্যে সংক্ষিপ্তভাবে বহুল বিতর্কীত দজ্জাল ও তার গাধা ও ইয়া'জূজ ও মা'জূজ সম্বন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। যদি এ আলোচনা হতে আপনাদের এ বিষয়ে সম্পর্কিত গবেষণায় এবং ব্যক্তিগত জীবনে সামন্যতম উপকার হয় তাহলে মহান আল্লাহ্ পাকের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকব। কেননা, তিনিই কলম দ্বারা জ্ঞান-শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ্ করুন তাই যেন হয়, আমীন।

- জি, এম, ফিরোজ আহমদ

পরিপূর্ণ আন্তরিক ও বিশ্বস্ত খান সাহেব হযরত মুন্সী অরোড়ে খান (রাঃ) আহমদী সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতার প্রেম ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব

মূল ঃ মকসুদ আহমদ মুনীর, মুরব্বী সিলসিলা আহমদীয়া

[সততার প্রেমিক ও সততাকে খুব তাড়াতাড়ি বুঝেন। আনন্দের সাথে সেবা করেন। বরং তিনি তো দিন রাত এ চিন্তায় থাকেন যে, কোন সেবা আমার দ্বারা হোক। অনুপম সেবার বাসনা ও আত্মত্যাগী ব্যক্তি। আমি মনে করি তাঁর বিনয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক আছে। সম্ভবত তাঁর অন্য কিছুতে এত বেশি আনন্দ হ'ত না যেরূপ তাঁর নিজের ক্ষমতা নিজের অর্থ ও নিজের সত্তার সমস্ত সামর্থ্য দিয়ে যদি কোন সেবা সম্পাদন করতে পারতেন।] (ইযালায়ে আওহাম)

প্রাথমিক অবস্থা

হযরত মুন্সী মুহাম্মদ অরোড়ে খান সাহেব আহমদীয়া সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা হযরত আকদস (আঃ)-এর প্রাথমিক সময়ের সাহাবীদের একজন। তিনি সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতার ৩১৩ জন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত। কপুরথলা তাঁর জন্মভূমি ও আবাসস্থল। ৮০ বছরের বেশি বয়স পান। (রেওয়ায়াত, মুন্সী জাফর আহমদ, পৃষ্ঠা ৮)।

তিনি ঐ সময়ের মক্তব, মাদ্রাসার পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু কম বয়সে তাঁর আব্বা তাঁকে কাজে লাগান। যখন তাঁর আব্বা ইন্তেকাল করেন তিনি তখনও ছোট ছিলেন। পরিবারের বড় ছেলে হওয়ার সুবাদে সংসারের সব বোঝা তাঁর কাঁধে বর্তায়।

চাকুরী

ছোট বয়স থেকেই তিনি আদালতে কাজ শুরু করেন। কিছুদিন পর এ পদে স্থায়ী হন। তিনি সরকারী চাকুরীতে অস্বাভাবিক উন্নতি করেন। মুন্সী জাফর আহমদ সাহেবের বর্ণনায় আছে ঃ মুন্সী অরোড়ে সাহেব মরহুম আদালতে ড্রাফটস্‌ম্যান ছিলেন। পদোন্নতি পেয়ে তিনি তহশীলদার হন ও অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর জীবন সহজ সরল ছিল। লোকে তাঁকে বাপের মত সম্মান করতো। মিঃ এল ফ্রেন্ড কপুরথালার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। পরে তিনি পাঞ্জাব গভর্ণমেন্টের চীপ সেক্রেটারী হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী মহোদয় প্রভাবশালী ও দাপটের হাকিম ছিলেন। ছোট বড় সকলে তাঁর শৃঙ্খলাবোধে কম্পমান ও সন্ত্রস্ত থাকতো। তিনি মুন্সী অরোড়ে খান সাহেবকে খুব সম্মান করতেন এবং তাঁর সম্পর্কে বলেন, "অফিসার এরূপ হওয়া উচিত যেন নিজের সততা ও সরলতার জন্য প্রজাদের হৃদয়ে স্থান পায়"। প্রধানমন্ত্রী মহোদয় একবার সফরে যান এবং লোকদের জিজ্ঞেস করেন তোমাদের তহশীলদার কেমন। সকলে একবাক্যে বলেন, তিনি আমাদের বাপের মত। আমাদের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী। প্রধানমন্ত্রী মুন্সী সাহেবের ঘর দেখেন। তা ঝুপড়ী ছাড়া আর কিছুই নয়। এতে তিনি প্রভাবিত হন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে প্রথম সাক্ষাৎ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে তাঁর প্রথম দেখা হয় ১৮৮৪ সালে। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "হযরত আকদস (রাঃ) বাটালাতে অবস্থান করছিলেন। তখন প্রথম বশীর জীবিত ছিলেন এবং তাঁর চোখের ব্যথা ছিল। খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় যে, যদি আপনি ইলহাম প্রাপ্ত হন তবে আমরা খামের মধ্যে কিছু লিখে রাখবো। আপনি তা বলে দেবেন।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, আমাদের খোদা শক্তিশালী তিনি গোপন লেখাকে নিজের বান্দাদের বলে দেন। কিন্তু যখন কিছু লেখা আমি বলে দেব তখন আপনাদের ঈমান আনতে হবে।" হযরত মুন্সী সাহেব বর্ণনা করেন। "আমরা ধার্মিক ছিলাম। মৌলভীদের ডেকে ওয়াজ করাতাম। কিন্তু এরূপ ব্যক্তি যিনি ইসলামের সত্যতার প্রমাণের জন্য বুকটান করে শত্রুদের মোকাবেলায় এসেছেন এবং বলছেন, আমি প্রমাণ দেব। আর কেউ এলো না। এ কথাই আমাদের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে" (রেওয়ায়াত, মুন্সী জাফর আহমদ, পৃষ্ঠা ১০)।

বয়াত

১৮৮৪ সালে বারাহীনে আহমদীয়া পাঠ করার পর হযরত আকদসের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট আবেদন করতে থাকেন, হুযূর বয়াত নিন। হযরত মুন্সী জাফর আহমদ বলেন, "সুরমা চশমে আরীয়া প্রকাশ হলে হুযূর (আঃ) চারকপি আমাকে ও চারকপি মুন্সী চেরাগ মুহাম্মদ সাহেবের নিকট কপুরথলাতে পাঠান। চেরাগ মুহাম্মদ সাহেব দীনাপুর (গুরুদাসপুরের নিকট) নিবাসী ছিলেন। মুহাম্মদ খান সাহেব, মুন্সী অরোড়ে সাহেব, মুন্সী আব্দুর রহমান সাহেব এবং খাকসার ইহা মসজিদে বসে পড়তাম। পরে মুহাম্মদ খান সাহেব, মুন্সী অরোড়ে সাহেব এবং আমি কাদিয়ানে যাই। আমরা তিনজন হুযূরকে বয়াতের জন্য বলি। কারণ "সুরমা চশ্‌মে আরীয়া পড়ার পরে আমরা তিনজনেই বয়াতের ইচ্ছা নিয়েই নেই"। তিনি বলেন, আমার বয়াতের আদেশ নেই। আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে থাক। তখন আমরা তিনজন অনেক বার কাদিয়ানে যাই (রেওয়ায়াত মুন্সী জাফর আহমদ, পৃষ্ঠা ৮৬, ১৯৯১ মুদ্রিত)।

হযরত শেখ মুহাম্মদ আহমদ সাহেব মযহার বর্ণনা করেন, "আমার আব্বা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে কয়েক বার অনুরোধ করেন, হুযূর বয়াত নিয়ে নিন। কিন্তু হুযূর অস্বীকার করেন যে, আমার আদেশ হয় নি। যখন লুধিয়ানাতে হুযূর বয়াতের জন্য ঘোষণা করেন তখন তিনি আমার আব্বা, মুহাম্মদ খান সাহেব এবং মুন্সী অরোড়ে সাহেবের নামে চিঠি লেখেন যে, আপনারা বয়াতের জন্য বলতেন। আমার এখন ঐশী সম্মতি হয়েছে। এ চিঠি অনুসারে তাঁরা লুধিয়ানায় পৌঁছে বয়াত করেন" (রেওয়ায়াত, হযরত মুন্সী জাফর আহমদ, পৃষ্ঠা ১৩)।

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ বলেন, "সবুজ কাগজে হুযূর যখন বিজ্ঞাপন জারী করেন তখন আমার কাছেও ৬/৭টি বিজ্ঞাপন পাঠান। মুন্সী অরোড়ে সাহেব সাথে সাথে লুধিয়ানায় রওয়ানা হন। বিজ্ঞাপন পৌঁছানোর দ্বিতীয় দিন রওয়ানা হয়ে তৃতীয় দিন সকালে আমরা বয়াত গ্রহণ করি। প্রথমে মুন্সী অরোড়ে খান সাহেব পরে আমি। আমি যখন বয়াত করতে শুরু করি

তখন হুযূর (আঃ) জিজ্ঞেস করেন, আপনার বন্ধু কোথায়? আমি বলি, মুন্সী অরোড়ে সাহেব তো বয়াত করেছেন। মুহাম্মদ খান সাহেব গোসল করছিলেন। তিনি গোসল করে বয়াত করেন। মুন্সী আব্দুর রহমান সাহেব, মুন্সী অরোড়ে সাহেব এবং মুহাম্মদ খান সাহেব বয়াত করেই ফেরত আসেন। তাঁরা তিনজন চাকুরিজীবী ছিলেন। আমি ১৫/২০ দিন লুধিয়ানাতে থাকি (রেওয়ায়াত, হযরত মুন্সী জাফর আহমদ, পৃষ্ঠা ৮৭)।

হযরত আকদসের সাথে সাক্ষাতের পরম্পরা

হযরত মুন্সী সাহেব প্রায়শঃ কাদিয়ানে আসতেন। এক্কা থেকে নেমে হযরত সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং ফেরত যেতেন। হযরত সাহেব বলতেন, "মুন্সী সাহেব এত তাড়াতাড়ি"। তিনি নিবেদন করতেন, "হযরত সাহেব, দর্শনের জন্য এসেছি।"এজন্য হযরত সাহেব প্রায় এ কবিতা পড়তেন ঃ

দরহকিকত বাস আস্ত ইয়ার একে

দিল একে, জাঁ একে, নেগার একে (আল্ ফযল, ১/১১/১৯১৯)। অর্থাৎ আসলে বিষয় এখানেই শেষ বন্ধু এর প্রাণ এক, মন এক দৃষ্টিও এক।

হযরত মুন্সী সাহেব যখনই অবসর পেতেন কাদিয়ানের দিকে দৌড়াতেন। সৈয়্যদ আযীযুর রহমান বেরেলবী বর্ণনা করেন, "কপুরথলায় চাকরীকালীন সময়ে যদি কখনো ১ দিনের ছুটি পাওয়া যেত, কিম্বা যদি টাকা-পয়সা কাছে আসতো তো মুন্সী অরোড়ে সাহেব বলতেন, তোমাদের নেশা লাগে নি। আমাদের মধ্যে যদি কেউ বলতো, এখন হাত খালি। তিনি খুব রাগ করে বলতেন, আমার সামনে থেকে চলে যাও।

হযরত মুন্সী সাহেব যখন কাদিয়ানে আসতেন তো নতুন নতুন রাস্তা দিয়ে আসতেন। প্রত্যেক বার নতুন নতুন উপহার নিয়ে আসতেন। কাদিয়ানে এসে মসজিদের এমন স্থানে কাপড় রাখতেন যাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট বসতে পারেন। নামায শেষ হতেই হযরত সাহেবের পা জড়িয়ে ধরতেন। হযরত সাহেব তাঁকে দেখলেই নিজের পা বাড়িয়ে দিতেন আর খান সাহেব আস্তে আস্তে পা টিপতে থাকতেন (আল ফযল, কাদিয়ান, ১-১১-১৯১৯)।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হযরত মুন্সী সাহেবের কাদিয়ানে যাওয়ার জন্য ছুটি চাওয়ার ঘটনা ঃ

হযরত মুন্সী সাহেবের মনে হযরত আকদস (আঃ)-এর সাথে দেখা করার জন্য ইচ্ছা ও ব্যাকুলতা কীরূপ ছিল সে সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী বর্ণনা করেন, "একবার কোন বন্ধু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খেদমতে এক ঘটনা বলেন, যাতে হযরত সাহেব হেসে ফেলেন এবং মজলিসে অন্য যারা ছিলেন তারাও আনন্দ পায়। মুন্সী অরোড়ে খান সাহেব প্রথম প্রথম কাদিয়ানে খুব আসা-যাওয়া করতেন। কিন্তু পরে তাঁর ওপর কিছু গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে। সেজন্য তাড়াতাড়ি ছুটি পাওয়া মুস্কিল হয়ে যায়। তবুও তিনি প্রায় কাদিয়ানে আসতেন। আমার মনে আছে যখন আমি ছোট ছিলাম তাঁর আসা এরূপ ছিল যেন কোন হারিয়ে যাওয়া ভাই কোন আত্মীয়ের সাথে অনেক বছর পরে মিলিত হচ্ছেন। কপুরথলা জামাত থেকে মুন্সী অরোড়ে খান সাহেব, মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব, ও মুন্সী মুহাম্মদ খান সাহেব যখন আসতেন, তাঁদের আসায় আমার খুব আনন্দ হতো) ... ওই বন্ধু বলেন, মুন্সী অরোড়ে খান সাহেব তো এরূপ ব্যক্তি যে, তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটদের ভয় পাইয়ে দেন। একবার তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলেন, আমি কাদিয়ান যেতে যাই। আমাকে ছুটি দিন। ম্যাজিষ্ট্রেট দিতে অস্বীকার করে। এ সময় তিনি সেশন জজের দপ্তরে কাজ করতেন। তিনি বলেন, কাদিয়ানে আমাকে অবশ্যই যেতে হবে। ছুটি দিন। ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, কাজ অনেক আছে এখন ছুটি দেয়া যাবে না। তিনি বলতে থাকেন, খুব ভাল। আপনার কাজ হতে থাক। আমি তো আজ থেকে বদ্‌দোয়া করতে শুরু করলাম। আপনি যদি যেতে না দেন তো না দেন। এ ম্যাজিষ্ট্রেটের এমন কোন ক্ষতি হল যে, তিনি খুব ভীত হলেন। এরপর যখন বৃস্পতিবার আসতো তিনি আদালতের সকলকে বলতেন, আজ কাজ তাড়াতাড়ি শেষ কর। মুন্সী অরোড়ে সাহেবের গাড়ীর সময় হয়ে যাবে। এরপর যখনই মুন্সী সাহেবের কাদিয়ানে আসার ইচ্ছা হ'ত তাঁকে ছুটি দেয়া হত এবং তিনি কাদিয়ানে পৌছে যেতেন (আল্ ফযল কাদিয়ান, ২৮-৮-১৯৪১)।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কপুরথলা আগমন এবং মুন্সী সাহেবের সর্বোচ্চ ভালবাসা ঃ

একবার হযরত আকদস (আঃ) কপুরথলা যান। যেরূপ সর্বোচ্চ ভালাবাসা ও আনুগত্য মুন্সী সাহেব দেখান সে সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বর্ণনা করেন, "তাঁর ভালবাসার এরূপ নিদর্শন ছিল যা আমি কখন ভুলবো না। তিনি নিজেই আমাকে শুনিয়েছেন; কিন্তু আমার সামনে এগুলো এরূপ ভেসে ওঠে যে, মনে হয় যেন এ সময়ে আমি ওখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাকে বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ওয়াদা করেন যে, যখনই অবসর পাব চলে আসবো। তিনি বলেন, একবার কপুরথলাতে আমি এক দোকানে বসেছিলাম। এক কঠোর বিরোধী স্টেশনের দিক থেকে এসে আমাকে বলে তোমাদের মির্যা কপুরথলাতে এসেছে। আমার মনে হ'ল হযরত মসীহ্ মাওউদ ও মাহ্দী (আঃ)-এর যখন অবসর হয়েছিল তখন খবর দেয়ার সময় ছিল না। তিনি সংবাদ না দিয়েই চলে এসেছেন। আরোড়ে খান সাহেব এ খবর শুনেই আনন্দে খালি মাথা ও খালি পায়ে স্টেশনের দিকে দৌড়ান। যেহেতু খবর দেয়া লোকটি কঠোর বিরোধী ছিল এবং সব সময় আহমদীদের ঠাট্টা-পরিহাস করতো, তার সাথে কথা বলে কিছু দূরে গিয়ে আমার মনে হ'ল এতো কুচক্রী শত্রু, এ নিশ্চয় আমার সাথে ঠাট্টা করেছে। সুতরাং আমি পাগলপারা হয়ে গেলাম এ চিন্তায় যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এসেছেন কি আসেন নি। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং রাগে গাল-মন্দ শুরু করলাম। তুমি বড় কু-চক্রী বদমাশ। তুমি কখনও আমার পেছন ছাড়ো না। আমার সাথে সব সময় হাসিঠাট্টা কর। হায়! আমার সৌভাগ্য কি হবে যে, হযরত সাহেব কপুরথলায় আসবেন। সে বলে, আপনি নারাজ হবেন না। গিয়ে দেখেন। প্রকৃতপক্ষে মির্যা সাহেব এসেছেন। সে এরূপ বলাতে আমি আবার দৌড়াতে শুরু করলাম। কিন্তু আবার মনে হলো যে, নিশ্চয় সে আমাকে ঠকিয়েছে। সুতরাং আবার আমি তাকে শাসাতে লাগলাম যে, তুমি তো বড় মিথ্যুক। সব সময় আমার সাথে পরিহাস কর। আমাদের ভাগ্য এরূপ কীভাবে হবে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের এখানে আসবেন। সে আবার বললো, মুন্সী সাহেব সময় নষ্ট করবেন না। মির্যা সাহেব প্রকৃতপক্ষে এসেছেন। আমার

মনে হ'ল সম্ভবতঃ এসেছেন। আমি আবার দৌড়ালাম। আবার মনে হ'ল সম্ভবতঃ ধোঁকা দিয়েছে। ফের তাকে শাসাতে লাগলাম। শেষে সে বললো, আমাকে গাল-মন্দ না দিয়ে নিজের চোখে দেখে আসুন। মির্যা সাহেব সত্যই এসেছেন। সুতরাং আমি কখনও দৌড়ালাম। আবার যখন মনে হ'ত আমাকে ঠকানো হয়েছে। তখন থেমে যেতাম। আমার এরূপ অবস্থা ছিল। আমি সামনের দিকে দেখলাম তো মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আসছেন। এরূপ উচ্চাঙ্গের ভালভাসা এবং ভালবাসার রঙ খুব কম লোকের হৃদয়ে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে কম ব্যক্তির এরূপ হৃদয় আছে" (আল্ ফযল, কাদিয়ান, ২৮/৮/১৯৪১)।

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব এ ঘটনা সম্পর্কে এভাবে বলেন, "মুন্সী অরোড়ে খান সাহেব নিবেদন করেন, হুযূর আসার কথা যদি জানাতেন তবে আমরা করতারপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হতাম। হুযূর (সঃ) বলেন, খবর দেয়ার কি প্রয়োজন। আমি আপনাদের সাথে ওয়াদা করেছি তা পূর্ণ করার জন্য। একদিন থাকার পর হুযূর (সঃ) কাদিয়ানে ফেরত যান। আমরা করতারপুর ষ্টেশনে পৌছানোর জন্য যাই অর্থাৎ মুন্সী অরোড়ে খান, মুহাম্মদ খান সাহেব ও আমি (রেওয়ায়াত, হযরত মুন্সী জাফর আহমদ, পৃষ্ঠা ৮৯, ৮-১৪ জুলাই ১৯৩৬ তারিখের আল্ হাকামের বরাতে)

'ইযলায়ে আওহাম' পুস্তকে অরোড়ে খান সাহেবের পবিত্র ঘটনাবলী ও আত্মত্যাগের উল্লখ ঃ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্-প্রেমিক মুন্সী মুহাম্মদ আরোড়ে খান ড্রাফটস্ম্যান, ম্যাজিষ্ট্রেসী, ভালবাসা, সততা ও সিদ্ধান্তে প্রাণোচ্ছল ব্যক্তি। তিনি সততার প্রেমিক, ও সততাকে খুব তাড়াতাড়ি বোঝেন, খুব আনন্দের সাথে সেবা করেন। এবং তিনি তো দিন রাত এ চিন্তায় থাকেন যেন কোন সেবা তাঁর দ্বারা হয়। অনুপম সেবার বাসনা ও আত্মত্যাগী ব্যক্তি। আমি মনে করি তার বিনয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক আছে। সম্ভবতঃ তাঁর অন্য কিছুতে এর বেশী আনন্দ হত না যেরূপ তাঁর নিজের ক্ষমতা, সম্পদ ও নিজের অস্তিত্ব দিয়ে যদি কোন সেবা সম্পাদন করতে পারেন। আর মনে প্রাণে একনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত এবং বিনয়ী ও সাহসী ব্যক্তি। খোদাতাআলা তাঁরে উত্তম প্রতিদান দিন, আমীন" (ইযালায়ে আওহাম)।

হযরত মুন্সী সাহেবের পেনসন পাওয়া এবং কাদিয়ানে বসবাস ঃ

হযরত মুন্সী সাহেব অবসর পাওয়ার পর স্থায়ীভাবে কাদিয়ানে বসবাস শুরু করেন। ১৯১৬ সালে তিনি প্রেমাস্পদের দেশে চলে যান।

কাদিয়ানে তাঁর জীবন যাপন পদ্ধতি ঃ

হযরত শেখ মুহাম্মদ আহমদ মযহার সাহেব বলেন,"পেনশন পাওয়ার পর মরহুম কাদিয়ানে আসেন। প্রকৃতপক্ষে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। নিজের তরকারী নিজে তৈরী করতেন এবং লংগর খানা থেকে রুটি কিনে নিতেন। আর মসজিদে মোবারকের প্রথম সারির দক্ষিণ দিকের শেষ প্রান্তে যেখানে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নামায পড়তেন সেখানে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন। এটা বরদাশ্ত করতেন না যে, অন্য কোন ব্যক্তি এ স্থান দখল করুক। এ ছিল তাঁর প্রেম ও ভালবাসা যার জন্য এ স্থানকে ভালবাসতেন। আমার ছোটবেলা থেকে কাদিয়ানে আসা-যাওয়া ছিল। সেজন্য মুন্সী অরোড়ে খান সাহেব আমাকে খুব ভালবাসতেন। আমি আইন পরীক্ষা দিই। মুন্সী সাহেবের কাছে দোয়ার জন্য আবেদন করি। তিনি বলেন, "খুব ভাল, দোয়া করবো"। আমার এক ছাত্র বন্ধু ছিল সে-ও মুন্সী সাহেবের কাছে দোয়ার জন্য বলে। মুন্সী সাহেব কিছু বাধ্যবাধকতা মনে করে বলেন, না ভাই, আমি একটি ওয়াদা করেছি। দোয়া করতে গেলে একটি মানুষ জবাই হয়ে যায়। "হালাল হো জান্দা হ্যাঁয়"- এ ছিল মুন্সী সাহেবের কথা। মোটকথা দোয়া ও পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দোয়ার সম্পর্কে মুন্সী সাহেবের এ নমুনা খুবই চিন্তা করার বিষয় (রেওয়ায়াত, হযরত মুন্সী জাফর আহমদ, পৃষ্ঠা ১০)।

কেবল একটা ইচ্ছা বাকি ঃ

হযরত শেখ মুহাম্মদ আহমদ মযহার সাহেবের বর্ণনা, হযরত মুন্সী অরোড়ে খান সাহেবের হৃদয়ে বেহেশ্তি মকবরাতে সমাধিস্থ হওয়ার প্রবল ইচ্ছা ছিল। হযরত শেখ সাহেব বলেন- "একদিন মুন্সী অরোড়ে সাহেব বেহেশ্তি মকবরার দিকে যাচ্ছিলেন। আমি সাথে ছিলাম। তিনি বলেন, বাস, আমার একটা ইচ্ছা বাকি আছে। আর বেহেশ্তি মকবেরার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এ মাটির শরীর এখানে দাফন হতে বাকি (রেওয়ায়াত, হযরত জাফর আহমদ, পৃষ্ঠা ১০)।

একবার কপুরথলা আগমন

কাদিয়ানে স্থায়ীভাবে বসবাসের পর তিনি খুব কম কপুরথলাতে যেতেন। একবার ওখানে যান। জুমুআর দিন ছিল। বন্ধুরা তাঁকে খুতবা দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। মুন্সী সাহেব তাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সকলের তাগিদে তিনি খুতবা দেয়ার জন্য দাঁড়ান। হযরত শেখ মুহাম্মদ আহমদ মযহাব সাহেব বলেন, "যেহেতু মুন্সী সাহেবের স্বভাব খুব রাগী ও সরল ছিল। এ জন্য যে খুতবা তিনি দেন তা তলোয়ারের মত ধারালো। তিনি বলেন ... তোমরা আমাকে খুতবা পড়তে বলো। আর তোমাদের ব্যবহারে আমি অসন্তুষ্ট। সিলসিলাহ্র কাজে এবং চাঁদা দেয়ার ক্ষেত্রে অলস হয়ে গেছ। আমাদের ঐতিহ্য বজায় রাখতে পার নি। আমি তোমাদের ওপর খুব নারাজ। সোজা হয়ে যাও। পবিত্র হয়ে যাও। এরকম খুতবা মুন্সী সাহেব অসংলগ্নভাবে দেন। যেহেতু তিনি বুযূর্গ ছিলেন এবং তাঁর নিজের উদাহরণ সামনে ছিল। এজন্য সকলে অভিভূত ও লজ্জিত হলেন" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০)।

তাঁর মৃত্যু

১৯১৬ সালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। মৃত্যুর একদিন পূর্বে তিনি মসজিদে মোবারকে মাগরিবের নামায আদায় করেন। ২৫ অক্টোবর জুমুআর দিন (জুমুআর নামাযের পর) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ডাঃ হাশমত উল্লাহ্ খান সাহেবকে সাথে নিয়ে যান। নাড়ি দেখেন। খুব জ্বর ছিল। চোখ খোলা ছিল। তাঁকে চামচে করে দুধ খাওয়ানো হয়। হযরত খলীফা সানী নামায আসর পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। হযরত খলীফা রশিদউদ্দীন সাহেবের মতে অরোড়ে সাহেবের মাথার শিরা ফেটে যায়। রাত সাড়ে বারোটায় হযরত ডাঃ খলীফা রশিদউদ্দীন সাহেব ঘরে ফেরত আসেন। তাঁর ফেরার প্রায় এক ঘন্টা পরে এ সততার পূজারী প্রকৃত প্রভুর সাথে মিলিত হন। ২৬ অক্টোবর হযরত আম্মাজানের বাড়ীর ঘেরাওয়ের পাশে পোষ্টম্যান শেখ মুহাম্মদ সাহেব তাঁকে গোসল দেন। হযরত খলীফা সানী (রাঃ) আসরের নামাযের পর তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং জানাযা বহন করেন। বেহেশতি মকবরাতে তাঁকে দাফন করা হয়।

মুন্সী আরোড়ে খান সাহেবের চরিত্র ও আচার-ব্যবহার ঃ

মুন্সী অরোড়ে খান উত্তম কাজের জন্য পুরস্কার-স্বরূপ 'খান সাহেব' উপাধি পান। তিনি বলেন, "দেখুন খোদাতাআলা মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-

এর কথা কীরূপে সত্য প্রমাণিত করেন। তিনি আমার সম্পর্কে লেখেন যে, সত্য কাজের জন্য ও ব্যক্তি বাহাদুর। বাহাদুর পাঠানরা হয়। আমি জাতে ধোপা। তাঁর কথা সত্য প্রমাণের জন্য খোদাতাআলা আমাকে 'খান সাহেব' উপাধি দিয়ে দেন" (আল্ ফযল কাদিয়ান, ১-১১-১৯১৯)।

যখন মুন্সী সাহেবকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মসীহ্ হওয়ার দাবী শুনে আপনি ভয় পান নি। তিনি বলেন, "ভয়তো তার হবে যে তাঁকে দেখে নি। আমি তো তাঁকে দেখেছি। সুতরাং ভয় কিসের। তাঁর মুখমন্ডল আমাকে বলে দেয় যে, তিনি সত্য। আর যা বলেন সত্য বলেন। সমস্ত বিপদের সময় আল্লাহ্ আমাদের পা-কে সুদৃঢ় রেখেছেন" (আল্ ফযল কাদিয়ান, ২৮-৮-১৯৪১)।

আমি মির্যা সাহেবের মুখ দেখেছি ঃ

একবার এক জলসায় মৌলভী সানাউল্লাহ্ অমৃতস্বরী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন এবং আহমদীয়তের বিপক্ষে অনেক দলিল পেশ করেন। যখন মুন্সী সাহেবের এক বন্ধু এর উত্তর দিতে বলেন, তিনি বলেন, "আমি মির্যা সাহেবের চেহারা দেখেছি। তিনি মিথ্যুক হতে পারেন না" (আল্ ফযল কাদিয়ান, ১-১১-১৯১৯)।

আমি এরূপ পবিত্র ও জ্যোতির্ময় লোক কখনও দেখি নি ঃ

হযরত সাহেবযাদা বশীর আহমদ সাহেব মুন্সী সাহেবের আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা এবং মনের অবস্থা সম্পর্কে এক ঈমানবর্ধক ঘটনা এরূপে বর্ণনা করেন,"সম্ভবতঃ ১৯১৪-১৫ সালের কথা অল ইন্ডিয়া ইয়ংম্যান ক্রিশ্চিয়ানের সেক্রেটারী মিঃ এইচ ওয়ালটার কাদিয়ানে আসেন। তার সাথে লাহোরের এফ, সি কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মিঃ লোকাসও ছিলেন। মিঃ ওয়ালটার একজন কলামিষ্ট। তিন আহমদীয়া সিলসিলা সম্পর্কে একটি পুস্তক প্রণয়নের জন্য কাদিয়ানে এসে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং আহমদীয়তের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেন। কথা-বার্তার সময় বাহাসের (বাক্যুক্ত) মত অবস্থা সৃষ্টি হয়। এরপর তিনি কাদিয়ানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। সবশেষে মিঃ ওয়ালটার আহমদী সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতার কোন পূর্ণো সংশ্রবধন্য ও বিশ্বাসীকে দেখতে চান। সুতরাং কাদিয়ানের মসজিদে মোবারকে হযরত মসীহ্ মাহ্দী (আঃ)-এর পুরাতন ও একনিষ্ঠ সাহাবী মুন্সী মুহাম্মদ অরোড়ে খান সাহেবের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ করানো হয়। এ সময় তিনি নামাযের জন্য মসজিদে অপেক্ষা করছিলেন। সাধারণ আলাপ-আলোচনার পর মিষ্টার ওয়ালটার মুন্সী সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন, "আপনি মির্যা সাহেবকে কতদিন থেকে জানেন। আপনি তাঁকে কোন্ দলিলের জন্য মানেন। তাঁর কোন্ বিষয়টি আপনার উপর সব থেকে বেশি প্রভাব সৃষ্টি করেছে"। মুন্সী সাহেব খুব সরলতার সাথে উত্তর দেন, আমি হযরত মির্যা সাহেবকে তাঁর দাবীর পূর্ব থেকে জানি। আমি এরূপ পবিত্র ও জ্যোতির্ময় মানুষ কোথায়ও দেখি নি। তাঁর জ্যোতি এবং তাঁর চুম্বকের মত আকর্ষণ করা ব্যক্তিত্ব আমার কাছে তাঁর সত্যতার বড় দলিল। আমি তো তাঁর মুখমন্ডল দেখার জন্য ক্ষুধার্ত ছিলাম।"

একথা বলে মুন্সী অরোড়ে সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদের স্মরণে ব্যাকুল হয়ে এরূপভাবে কাঁদতে থাকেন যেমন একটি শিশু তার মার সাথে বিচ্ছেদের ফলে অস্থির হয়ে কাঁদে। এ দৃশ্য দেখে মিঃ ওয়ালটার সাহেবের মুখমন্ডল ফ্যাকাশে হয় যায়। তিনি অবাক হয়ে মুন্সী সাহেবের দিকে মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকেন। তার মনে মুন্সী সাহেবের এসব কথা এরূপ প্রভাব বিস্তার করে যে, তিনি তাঁর বই আহমদীয়া মুভমেন্ট-এ এ ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন আর লেখেন, "মির্যা সাহেব ভুল করেছেন একথা আমরা বলতে পারি। কিন্তু যে ব্যক্তির সংশ্রব তাঁর অনুসারীদের ওপর এরূপ গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে তাঁকে ধোঁকাবাজ বলা যায় না"।

প্রকৃতপক্ষে যদি মানুষের নিয়্যত পরিষ্কার থাকে আর যদি তার মন ও মস্তিষ্কের দরজা খোলা থাকে তবে কোন কোন সময় পবিত্র ব্যক্তির মুখমন্ডলের এক ঝলক কিম্বা মুখের একটি কথা হৃদয় আলোকিত করার জন্য যথেষ্ট হয়। নবী ও আউলিয়াদের ইতিহাস এরূপ ঘটনায় পরিপূর্ণ যে, একজন বিরোধী মোখালেফাতের উত্তেজনা নিয়ে আসে এবং প্রথম দৃষ্টিতে কিম্বা প্রথম কথায় ঘায়েল হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এক কবিতায় বলেন,

সাফ দিলকো কস্রতে ই'জায কি হাজত নেহীঁ
এক নিশাঁ কাফি হ্যায় গার দিলমে হো খওফে কিরদিগার (বারাহীনে আহমদীয়া)।

হযরত মুন্সী সাহেবের মালী কুরবানীর প্রেরণা ও ইচ্ছা ঃ

হযরত মুন্সী অরোড়ে খান সাহেবের মালী কুরবানীর জন্য প্রেরণা ও আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা আছে ঃ হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর সাহেব বলেন, "প্রাথমিক সময়ে একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লুধিয়ানাতে কোন জরুরী তবলীগে বিজ্ঞাপন ছাপানোর জন্য ষাট টাকার প্রয়োজন হয়। এ সময় হযরত সাহেবের কাছে এ পরিমাণ টাকা ছিল না। তৎক্ষণাৎ এ টাকার খুবই প্রয়োজন ছিল। হযরত জাফর আহমদ সাহেব বলেন- এ সময় লুধিয়ানাতে হযরত সাহেবের কাছে আমি একা আসি। হযরত সাহেব আমাকে ডেকে বলেন এখন অত্যাবশ্যকীয়ভাবে এ টাকার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আপনার জামাত কি এ টাকার ব্যবস্থা করতে পারবে। আমি নিবেদন করি, হযরত, ইন্শাআল্লাহ্ করতে পারবে। আমি গিয়ে টাকা নিয়ে আসছি। আমি তৎক্ষণাৎ কপুরথলা গেলাম। জামাতের কোন ব্যক্তিকে না জানিয়ে নিজের স্ত্রীর এক গহনা (তল্ড়ী) বিক্রী করে ষাট টাকা যোগাড় করি। লুধিয়ানায় এসে হযরত সাহেবের হাতে পেশ করি। হযরত সাহেব খুব সন্তুষ্ট হন। (কারণ হযরত সাহেব মনে করেন যে, এ টাকার ব্যবস্থা জামাত করেছে)। তিনি কপুরথলা জামাতের জন্য দোয়া করেন। কিছুদিন পর মুন্সী অরোড়ে সাহেব লুধিয়ানাতে আসলে হযরত সাহেব সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, "মুন্সী সাহেব আপনার জামাত খুব প্রয়োজনের সময় সাহায্য করেছে। মুন্সী সাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, "হযরত কোন্ সাহায্য, আমার তো জানা নেই।" হযরত সাহেব বলেন, "এই যে, মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব কপুরথলা জামাতের তরফ থেকে ষাট টাকা এনেছে।" মুন্সী সাহেব বলেন, "হযরত, মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব তো আমার কাছে এর কোন উল্লেখ করেন নি তিনি জামাতকেও জানান নি। আর আমি তাকে জিজ্ঞেস করবো, কেন আমাদের জানানো হয় নি? এরপর মুন্সী অরোড়ে সাহেব আমার কাছে আসেন ও অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, হযরত সাহেবের প্রয়োজন দেখা দিল আর আপনি আমাকে বললেন না। আমি বললাম, মুন্সী সাহেব, সামান্য টাকা। আর আমার স্ত্রীর গহনা দিয়ে তা পূরণ করেছি। এতে আপনার অসন্তুষ্ট হওয়ার কথা নয়। কিন্তু মুন্সী সাহেবের রাগ কম হ'ল না। তিনি বার বার বলতে থাকলেন যে, হযরত সাহেবের একটি প্রয়োজন দেখা দিল আর আপনি আমার উপর জুলুম করলেন। আমাকে বললেন না।মুন্সী অরোড়ে সাহেব ছ'মাস আমার ওপর রাগ করে ছিলেন। (রেওয়ায়াত, হযরত মুন্সী জাফর আহমদ পৃষ্ঠা ৬১)। (চলবে)।

অনুবাদ - **কওসার আলী মোল্লা**

খুলনা অঞ্চলের নও মোবাঈনদের ১ম তালীম-তরবিয়তি ক্লাস অনুষ্ঠিত

১ম ব্যাচের নও মুবায়েঈন তা'লীম তরবিয়তি ক্লাস- ২০০২ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনায় অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত খুলনাঞ্চলের তবলীগী আহবায়ক জনাব সামসুর রহমান সাহেবের আহ্বানে গত ১৯/০৪/২০০২ইং তারিখ হতে ২৬/০৪/০২ইং তারিখ পর্যন্ত খুলনা অঞ্চলের নওমোবায়েঈনদের এক বিশেষ তা'লীম তরবিয়তি ক্লাস বায়তুর রহমান মসজিদ খুলনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে খুলনার প্রত্যন্ত অঞ্চল কয়রা, খেলার ডাংগা, বাক্সা এবং সাকদাহ্ থেকে প্রায় ১০ জন নও মোবায়েঈন বন্ধু অংশ গ্রহণ করেন। কখনও কখনও খুলনার স্থানীয় ভাইদের সহ প্রায় ২০/২২ জন পর্যন্ত ক্লাসে উপস্থিত হতেন। খুলনার স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব ফরহাদ হোসেন এবং সুন্দরবন জামাতের জনাব আব্দুল ওয়াদুদ নওমোবায়েঈন ভাইদের ক্লাস পরিচালনা করেন। এছাড়াও নওমোবায়েঈনদের তা'লীম তরবিয়তি ক্লাসের পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আব্দুর রাজ্জাক সাহেব এবং মানসুর আহমদ নাদির সাহেব জামাতের সাংগঠনিক ব্যাপারে বিভিন্ন দিক নিয়ে শিক্ষা প্রদান করেন।

ক্লাস শেষে এ সকল শিক্ষার্থী বন্ধুদের একটি লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। আর তাদের উৎসাহ বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রাখা হয়। এতে পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। ২৬শে এপ্রিল রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ তা'লীম তরবিয়তি ক্লাসের সমাপনান্তে নওমোবায়েঈন বন্ধুদের উদ্দেশ্যে প্রাঞ্জল ভাষায় অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ এক নসিহতমূলক বর্ক্তৃতা প্রদান করে বিভিন্ন প্রতিযোগিদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে পুরস্কার বিতরণ করেন খুলনাঞ্চলের তবলীগী আহবায়ক এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাত খুলনার আমীর শামসুর রহমান।

- গাজী ওমর ফারুক
সেক্রেটারী
ক্লাস পরিচালনা কমিটি

২য় ও ৩য় ব্যাচের নও মুবায়েঈন তা'লীম তরবিয়তি ক্লাস- ২০০২ সুন্দরবন জামাতে অনুষ্ঠিত

বিগত ১৫ই মে হতে ২১শে মে, ২০০২ ও ২৫শে মে হতে ৩১ মে, ২০০২ তারিখে যথাক্রমে খুলনা অঞ্চলের নওমেবায়েঈন তা'লীম তরবিয়তি ক্লাসের ১ম ও ২য় ব্যাচের প্রশিক্ষণের কাজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবনে মসজিদ বাইতুস্ সালাম এ অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে কুরআন নাযেরা, নামায শিক্ষা, আহমদীয়তের আকায়েদ, মাসলা -মাসায়েল, এতায়েতে নেযাম, তবলীগের গুরুত্ব, নযম শিক্ষা, আপত্তি খন্ডন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। প্রথম ব্যাচের ক্লাস পরিচালনার প্রধান দায়িত্বে ছিলেন মোয়াল্লেম

শেষ আব্দুল ওয়াদুদ এবং দ্বিতীয় ব্যাচের দায়িত্বে ছিলেন মোয়াল্লেম এনামুল হক (রনি) সাহেব। তাঁদের ক্লাস পরিচালনা সহযোগিতা দেন মোয়াল্লেম ফরহাদ হোসেন, দেহাতী মোয়াল্লেম জি, এম, ইদ্রিস আলী ও এম. মাগফুর রহমান। সাংগঠনিক আলোচনা করেন সংগঠনের প্রধানগণ। জামাতের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন প্রতিদিন বাদ মাগরিব মোহতরম আমীর জনাব এস, এম, আবূ কওসার, সেক্রেটারী তবলীগ জনাব শেখ মাহফুজুর রহমান, জেনারেল সেক্রেটারী এস, এম, রেজাউল করীম ও সেক্রেটারী মাল জি, এম আবূ মোসলেম প্রমুখ।

প্রোগ্রাম শেষে সমাপণী পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। অংশগ্রহণকারী দুই ব্যাচের ২২ জনকে সনদপত্র প্রদান ছাড়াও পুরস্কৃত করা হয়। সনদপত্র ও পুরস্কার প্রদান করেন ক্লাসদ্বয়ের আহবায়ক ও স্থানীয় আমীর জনাব এস, এম, আবূ কওসার সাহেব।

- মুকুল
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন

বরিশাল-পটুয়াখালী অঞ্চলের "ওয়াকফে নও" ও পিতা-মাতা তা'লীম-তরবিয়তী ক্লাস ও ৩য় বার্ষিক সম্মেলন-২০০২

বৃহত্তর বরিশাল-পটুয়াখালী অঞ্চলের ৩য় "ওয়াকফে নও" ও পিতামাতা তা'লীম-তরবিয়তী ক্লাস ও সম্মেলন-২০০২ গত ১লা-৩রা মে পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামাত, পটুয়াখালী-মসজিদে খোদাতাআলার অশেষ রহমতে সম্পন্ন হয়েছে, আল্হামদুলিল্লাহ্। ১লা মে সকাল ১০টায় তা'লীম তরবিয়তি ক্লাস ও সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। কুরআন তেলাওয়াত, নযম, দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন "ওয়াকফে নও" বিভাগীয় সেক্রেটারী শ, ম দেলওয়ার হোসেন। উক্ত সম্মেলনে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন ওয়াকফে নও সন্তান জনাব এস, এম, সায়হান ফেরদৌস মুন্না, নযম ঃ সালহানা তৌহীদ তুবা। উক্ত ক্লাসে অত্র অঞ্চলের "ওয়াকফে নও" সন্তানগণ ও পিতা- মাতাগণ বিপুল উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া অন্যান্য শিশুরাও অংশ গ্রহণ করেন।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী "ওয়াকফে নও" সাহেবের সভাপতিত্বে ৩রা মে সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সন্তানগণের মধ্যে ও পরীক্ষার অংশগ্রহণকারী মাতাগণকে পুরস্কৃত করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল সেক্রেটারী জায়েদাদ সাহেবও উপস্থিত ছিলেন।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী "ওয়াকফে নও" সাহেব দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপনী ঘোষণা করেন।

শম, দেলওয়ার হোসেন দিলীপ
বিভাগীয় সেক্রেটারী "ওয়াকফে নও"
বৃহত্তর বরিশাল-পটুয়াখালী অঞ্চল

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর

খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)

ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ

৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

New Vo. No. 64 ◆ 23nd Issue June 15, 2002 ◆Tk. 10.00

Fortnightly The AHMADI রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

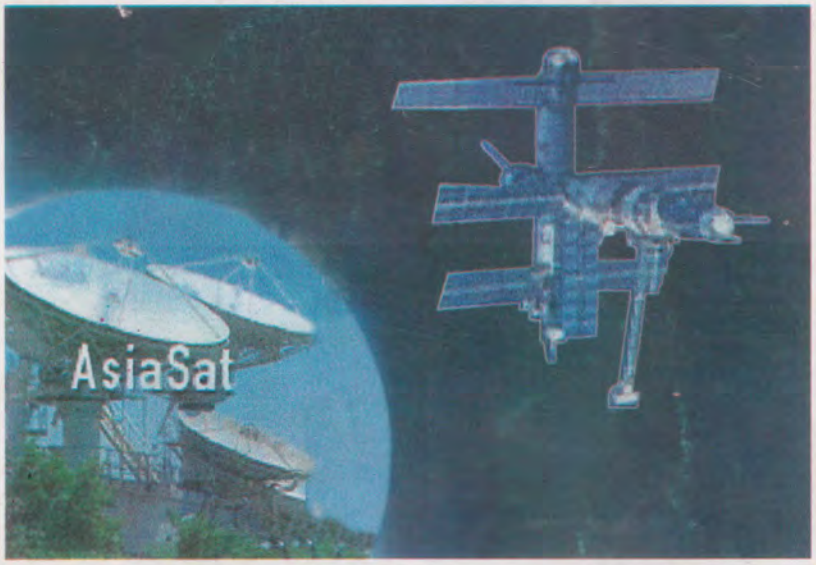

لا اله الا الله محمد رسول الله

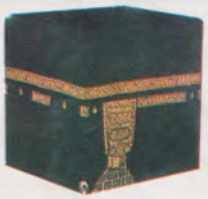

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি MTA -র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলা সম্প্রচার
- প্রতি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর সাথে বাংলা ভাষাভাষীদের মুলাকাত অনুষ্ঠান।

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST

FREQ.	-	3660
S.R	-	27500
POL	-	VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 88-02-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com